

আই লাভ ইউ, ম্যান – ২

মাসুদ রানা সিরিজ

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

পরের শনিবার।

ঢাকা।

মাসুদ রানার বাংলো।

অনেক কাজ ছিল-দ্রুত সব শেষ করে, কোনটা জাহেদ কোনটা গিলটি মিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দুটোর মধ্যে ঘরে ফিরে এসেছে রানা। রাঙার মা ছুটিতে, তাই ড্রাইভারকে দিয়ে লাঞ্চ পাঠিয়ে দিয়েছে সোহানা। পুঁই শাক, চেড়শ ভাজি, পটলের দোলমা, মুগের ডালের চচ্চড়ি, রুইয়ের কোর্মা, নারকেল চিংড়ি, সর্ষে ইলিশ ইত্যাদি সহযোগে ভরপেট ভাত খেয়ে, একটা সিগারেট ধ্বংস করে পিচ্চি একটা ঘুম দেয়ার জন্যে উঠে পড়েছে বিছানায়। রাত জাগতে হবে। সোহানা আসবে আজ গল্প শুনতে।

এদিকে বিকেল চারটেতেই ঢাকার বুকে নেমে এসেছে সন্ধ্যার কালিমা। ঘন কালো বৈশাখী মেঘে ঢাকা পড়েছে গোটা আকাশ। কিছুক্ষণের মধ্যে বার কয়েক বাতাসের ঝাপটা দিয়েই শুরু হয়ে গেল ঝম ঝম মুষলধারে বৃষ্টি।

ঘুমাচ্ছে রানা। অসময়ের উসখুস ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বর্গে, সেই অপূর্ব সুন্দর সেন্ট মেরী দ্বীপে চলে গেছে ও।

...স্বর্ণ হৃদয় দুজন মানুষ-রডরিক আর ল্যাম্পনি, প্রিয় বোট জলকুমারী, সাগর-তীরে পঁচিশ একর জমি নিয়ে শান্তির নীড়, বিগ গাল আইল্যান্ডের কাছে ডুবিয়ে রাখা সবুজ ক্যানভাস মোড়া রহস্য, এবং অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলার আকস্মিক আবির্ভাব-স্বপ্নের মধ্যে এদের স্পষ্ট ছবি দেখতে পাচ্ছে ও। দেখতে পাচ্ছে সরল হাসিতে উদ্ভাসিত তরুণ নিরোর মুখটা, শুনতে পাচ্ছে চলমান পাহাড় বিশালদেহী

ভূমায়ুন দাদার অট্টনাদ। তারপর হঠাৎ মুখোমুখি হল সেই আশ্চর্য ধূর্ত সিডনি শেরিডানের। অমনি চট করে ভেঙে গেল ঘুমটা।

চোখ মেলার আগেই একটানা রিমঝিম বৃষ্টির মিষ্টি সুর কানে এল, ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ এল নাকে। অদ্ভুত এক পুলকে শিরশির করে উঠল শরীর-মন। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল ও। জানালার শার্সি ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেল বাইরে। স্নান আলোয় রূপালী বর্ষার ঝাঁক মনে হচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে। বাগানে আটকে গেল চোখ। উজ্জ্বল লালে ছেয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়া, ডালগুলো দোল খাচ্ছে বাতাসে, থর থর কাঁপছে ফুলগুলো বৃষ্টির আঘাতে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে জাগরণের মধ্যেই সদ্য দেখা স্বপ্নের চরিত্রগুলো ফিরে এল চোখের সামনে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। আশ্চর্য একটা অস্থিরতা অনুভব করছে ও। কেউ যেন ভারী একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে ওর বুকের ওপর। সব কথা কাউকে বলে হালকা হতে হবে ওকে। অতি আপন, অতি প্রিয়, সহানুভূতিশীল শ্রোতা চাই একজন।

সোহানার কথাই মনে পড়ল। ওকে পেলে এখুনি শুরু করা যেত আবার।

ভাবতে না ভাবতেই সোহানা হাজির। আঁটসাঁট করে পরেছে লাল পেড়ে হলুদ সুতির শাড়ি, অনিন্দ্যসুন্দর মুখে অপূর্ব মিষ্টি হাসি, দুহাতে ধরে আছে বড়সড় একটা ট্রে। ট্রে-র ওপর রয়েছে একটা অ্যালুমিনিয়ামের গামলা-তাতে কাঁচা সরষের তেল, পেঁয়াজ, আদা আর বেশি করে কাঁচা মরিচ দিয়ে মাখানো গরম মুড়ি, দুগ্লাস পানি আর দুকাপ ধূমায়িত চা।

তুমি! বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল রানার চোখ। তোমার কথাই ভাবছিলাম। কখন এলে?

আকাশের অবস্থা দেখেই চলে এলাম। দেখি ঘুমাচ্ছ। বৃষ্টির ছিটে আসছিল, জানালাটা লাগিয়ে দিয়েই ভাবলাম তোমাকে ঘুম থেকে তুলতে হলে একটা কিছু ছুতো দরকার।

উঠে বসল রানা। ঝাল-মুড়ির দিকে চেয়েই জল এসে গেল জিভে। খুশি হয়ে বলল, দারুণ ছুতো তৈরি করেছ, মাইরি! হাত বাড়াল বিছানার ওপর নামিয়ে রাখা গামলার দিকে। উফ! থ্যাঙ্ক ইউ, সোহানা! মেজাজটা খুশি থাকতে থাকতেই চট করে বলে ফেল মতলব। গ্র্যান্ট হয়ে যেতে পারে।

সেই গল্পটা... হাসল সোহানা। বিছানায় উঠে বালিশে হেলান দিয়ে বসল আরাম করে। হাত চালাল গামলায়। নাও, শুরু করো।

জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলল রানা। তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলছে বাইরে। হ্যাঁ, এখনই গল্পের সময়। মেঘের মত সে-ও ভারমুক্ত হতে চাইছে। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, কোথায় যেন থেমেছিলাম, মনে আছে?

তোমরা লর্ড নেলসনের প্রাইভেট বারে বসে রয়েছ, বলল সোহানা। হোটেল হিলটনের সুইচবোর্ড অপারেটর মারিয়া এসে খবর দিল সকালের প্লেনে একজন অপরিচিতা ভদ্রমহিলা। এসেছেন, তোমার সাথে দেখা করতে চান।

হ্যাঁ, বলল রানা। মনে পড়েছে।

কাঁচা মরিচ চিবিয়ে ঝাল লেগে গেছে সোহানার-পানি খেয়ে, শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিল সে। নড়েচড়ে বসল। তারপর রানার দিকে তাকাল।

শুরু করল রানা।

দুই

দুপুরের খানিক পর গ্র্যাণ্ড হারবার ত্যাগ করলাম, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে যাচ্ছি। মাছ ধরব না, একথা জানিয়ে আমার ক্রুদেরকে একটা দিন ডাঙায় কাটাতে বলেছি।

ককপিট ডেকে পা ফাঁক করে দাঁড়ানো হলুদ বিকিনি পরা। রাফেলা বার্ডকে ভুরু কুঁচকে দেখেছে রডরিক, মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে বুলডগের মত চেহারা হয়েছে, কিন্তু কোন মন্তব্য না করেই। নেমে গেছে সে। কিন্তু কোর্টরের ভেতর চোখের মণি দুটোকে চরকির মত পাক খাইয়ে খ্যাক খ্যাক করে হেসেছে ল্যাম্পনি, তারপর সবজান্তার চংয়ে মাথা নেড়ে বলেছে, আনন্দ বিহারে যাওয়া হচ্ছে বুঝি? ভাল, ভাল।

খুব নোংরা মন তোমার, চাপা স্বরে বললাম ওকে।

শুনেই আত্মদে আটখানা হয়ে হাসল সে, যেন প্রশংসা করেছি ওর। জেটি ধরে যখন চলে যাচ্ছে, তখনও শোনা গেছে ওর সেই হাসি।

রীফের ছড়া এবং দ্বীপমালিকার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে জলকুমারী। তিনটের পর লিটল গাল আইল্যান্ড এবং বিগ গাল আইল্যান্ডের মাঝখানে গভীর পানি-পথে পৌঁছুলাম। প্যাসেজটা ধরে ঘুরে চলে এলাম আমরা বিগ গালের পূর্ব তীর আর মোজাম্বিকের নীল স্রোতের মাঝখানে অগভীর খোলা পানিতে।

প্রচুর জোরাল বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে আছে দিনটা, সাগরের গা থেকে ছাঁঁ মেরে ছাল তুলে নিয়ে সাদা ফেনায় ভরিয়ে তুলছে চারদিক।

ধীর গতিতে সাবধানে এগোচ্ছি, বিগ গালের দিকে চোখ রেখে সেদিকে সোজা করে রেখেছি বোট। নির্দিষ্ট চিহ্ন মিলে যাবার পরও আর একটু এগিয়ে গেলাম জলকুমারীকে নিয়ে, কেননা বাতাসের ধাক্কায় একটু পিছিয়ে আসবে সে। এরপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দ্রুত ফোরডেকে চলে এলাম নোঙর ফেলার জন্যে।

ঘুরে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত স্থির হল জলকুমারী।

এই জায়গায়? বিড়ালের জ্বলজ্বলে চোখে এতক্ষণ আমার প্রতিটি কাজ নিঃশব্দে লক্ষ্য করেছে রাফেলা।

হ্যাঁ, এই সেই জায়গা, বললাম ওকে, তারপর অন্ধ প্রেমের নমুনা হিসেবে বিয়ারিঙ মার্কগুলো দেখিয়ে দিলাম। বললাম, ওটা বিগ গাল আইল্যান্ড। দুটো পাম গাছ দেখতে পাচ্ছ? একটা ঝুঁকে পড়েছে, আর দ্বিতীয়টা ডান দিকে, সোজা দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তরেখার ওপর, দেখতে পাচ্ছ?

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ও।

ওই দুটোর মাঝখানের সরলরেখায় রয়েছি এখন আমরা।

এবারও কোন কথা বলল না রাফেলা। চোখে অদ্ভুত একটা অন্যমনস্ক কিন্তু স্থির দৃষ্টি, যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে গেঁথে নিচ্ছে তথ্যগুলো।

এখন কি করব আমরা? হঠাৎ জানতে চাইল ও।

ঠিক এইখানে ডাইভ দিয়েছিল নিরো, ব্যাখ্যা করছি আমি। পানি থেকে বোটে উঠে এল সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে। ব্ল্যাক্স আর প্যানথারের সাথে চুপিচুপি কথা বলল, সঙ্গে সঙ্গে ওরাও উত্তেজিত হয়ে উঠল। একটা ক্যানভাস আর দড়ি নিয়ে আবার পানিতে নামল নিরো। এবার অনেকক্ষণ পানির নিচে থাকল ও। তারপর যখন উঠে এল, শুরু হল ব্যাপারটা-আমাকে লক্ষ্য করে। গুলি ছুঁড়ল প্যানথার।

বুঝেছি, ব্যস্তভাবে বলল রাফেলা, ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর বিবরণ এতটুকু বিচলিত করছে না ওকে। তাড়াতাড়ি ফিরে যাই চল। এখানে কেউ দেখে ফেলবে আমাদেরকে।

চলে যাব? অবাক হলাম আমি। কি বলছ তুমি? কথা ছিল পানিতে নেমে দেখব...

নিজের ভুলটা বুঝতে পারল রাফেলা। তাড়াতাড়ি বলল, তার আগে ব্যাপারটা সুচারুভাবে গুছিয়ে নেয়া দরকার, রানা। তৈরি হয়ে আবার ফিরে আসব আমরা। জিনিসটা তোলার আর পরিবহনের ভাল বন্দোবস্ত করে শুধু শুধু পানিতে নেমে লাভ নেই। চল।

কিন্তু, নিঃশব্দে হাসছি আমি, এক নজর না দেখে চলে যাবার জন্যে তো এতদূর আসিনি!

শোনো, রানা-কাজটা উচিত হচ্ছে না তোমার, পেছন থেকে বলল রাফেলা। কিন্তু ইতিমধ্যে ইঞ্জিনরুমের হ্যাচ খুলতে শুরু করে দিয়েছি আমি।

বলছি তো আরেকবার আসা যাবে, বুঝতে পারছি অতি কষ্টে রাগ চেপে রেখে শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছে ও আমাকে। সবুরে মেওয়া ফলে, জানো না? সবই তো তোমার আর আমারপ্লীজ, একটু ধৈর্য ধর..., চেষ্টার কোন ক্রটি রাখছে না ও।

কথাগুলো কান পেতে শুনছি, কিন্তু মানছি না। মই বেয়ে র্যাকের কাছে নেমে গেলাম, একজোড়া এয়ার-বটল তুলে নিলাম সেখান থেকে। ব্রিডিং ভালভ ফিট করে নিয়ে রাবারের মাউথপীসে মুখ ঠেকিয়ে বাতাস টেনে পরীক্ষা করলাম সিলটা। হ্যাচের ওপর দিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম নিচের দিকে তাকিয়ে নেই ও, তারপর হ্যাচের গায়ের গোপন কুঠরীর দরজা খুলে লুকানো বোতামটা টিপে দিলাম। বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আমি ছাড়া আর কারও পক্ষে এখন আর জলকুমারীর ইঞ্জিন স্টার্ট করা সম্ভব নয়।

ডাইভিং বোর্ডটা ঠেলে স্টার্নের কাছে বোটের বাইরে বের করে দিলাম, পানির ওপর ঝুলে থাকল সেটা। তারপর ককপিটে দাঁড়িয়ে পোশাক পরে নিলাম। ওয়েট স্যুট আর হুড, ওয়েট বেল্ট আর নাইফ, ফেস প্লেট আর ফিন। পিঠে এয়ার বটল জোড়া বেঁধে নিয়ে এক কয়েল হালকা নাইলন রোপ বেল্টের হুকে লটকে নিলাম।

তুমি ফিরে না আসলে কি হবে? গম্ভীরভাবে জানতে চাইল রাফেলা। মানে, আমার কি হবে?

সম্ভবত মৃত্যু হবে, বলে ডাইভিং বোর্ডের ওপর দিয়ে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে গেলাম, লাফ দিয়ে পড়লাম পানিতে।

স্বচ্ছ কাচের মত পানি, কোথাও বাধা না পেয়ে একেবারে নিচে পর্যন্ত পৌঁছেছে আলো। পঞ্চাশ ফুট নিচে তলাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

অপূর্ব সুন্দর একটা প্রবালের জগৎ এটা। চোখ জুড়ানো নানান বিচিত্র রঙের ওপর স্পটলাইটের মত আলো পড়ে ঝলমল করছে চারদিক। ভাস্কর্য শিল্পীর বিচিত্র শিল্পকর্মের আশ্চর্য আকার। এবং আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রবাল খণ্ডগুলো, সেগুলোর ওপর কুয়াশা রঙের গাঢ় শ্যাওলা জমেছে, গায়ে ঝলমলে নকশা আর অলঙ্কার নিয়ে ঝক ঝক ট্রপিক্যাল মাছ চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গভীর খাঁদ এবং অনেক উঁচু আর একেবারে খাড়া প্রবালের স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি, মাঝখানে রয়েছে সাপের মত লম্বা ঘাসে ঢাকা মাঠ, চোখ ধাধানো সাদা প্রবাল বালির বিস্তৃতি।

রক্ত ঝরে গিয়ে শরীর দুর্বল এবং দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিয়ারিঙ চিহ্নগুলো নিখুঁতভাবেই নিতে পেরেছিলাম আমি, আজ তার প্রমাণ পেলাম সবুজ ক্যানভাসে মোড়া প্যাকেটটার একেবারে গা

ঘোঁষে নোঙরটা ফেলতে পেরেছি দেখে। উন্মুক্ত প্রবাল বালির ছোট্ট একটা বিস্মৃতির মাঝখানে পড়ে রয়েছে সেটা, সবুজ আর বেচপ, ভয়ালদর্শন একটা সামুদ্রিক জন্তু যেন, অক্টোপাসের শুড়ের মত পানিতে ভাসছে খোলা দড়িগুলো।

হাঁটু গেড়ে ওটার পাশে বসলাম আমি। সোনালি আর কালো জেব্রার টানা দাগ গায়ে নিয়ে খুদে মাছের ঝাঁক মৌমাছির মত চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল আমাকে, কাজে হাত লাগাবার আগে। বুদ্ধ বুদ্ধ ছুঁড়ে ভাগিয়ে দিলাম ওদেরকে।

বেল্ট থেকে নাইলনের রশিটা নামালাম। একটা প্রান্ত দিয়ে প্যাকেটটাকে শক্ত করে বেঁধে রশি ছাড়তে ছাড়তে উঠতে শুরু করলাম ওপর দিকে। জলকুমারীর পেছন দিকে ত্রিশ ফুট দূরে। পানির ওপর মাথা তুললাম আমি, সাঁতরে মইয়ের কাছে পৌঁছুলাম, তারপর উঠে পড়লাম ককপিটে। রশির দ্বিতীয় প্রান্তটা বাঁধলাম ফাইটিং চেয়ারের একটা পায়ের সাথে।

কি পেয়েছ তুমি? ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইল রাফেলা।

এখনও জানি না, বললাম ওকে। পানির নিচে প্যাকেটটা খুলে ভেতরে কি আছে দেখার প্রচণ্ড একটা কৌতূহল হয়েছিল আমার, কিন্তু অতি কষ্টে সেটাকে দমন করেছি। ক্যানভাস খোলার পর রাফেলার প্রতিক্রিয়াটা প্রথম করতে চাই আমি।

ডাইভিং গিয়ার খুলে নির্মল পানি দিয়ে সেগুলো ধুচ্ছি আমি। ধোয়ামোছার পর যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে দিলাম। এভাবে সময় কাটাবার একটাই কারণ, আমি চাইছি উদ্বেগ আর উত্তেজনা আর একটু ক্ষতবিক্ষত করুক রাফেলাকে।

দুত্তোরি ছাই! কি পেয়েছ তুমি? আগে ওটা তুলতে কি হয়েছে? অবশেষে রাগে ফেটে পড়ল ও।

মনে পড়ল পাহাড়ের মত ভারী লেগেছিল প্যাকেটটা, একটু নাড়তেই হিমশিম খেতে হয়েছিল আমাকে- তবে তখন শরীরে শক্তি বলতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এখন আমি গানেল আলিঙ্গন করে রশি টেনে তোলার সময় জিনিসটার ওজন অনুভব করছি-ভারী বটে কিন্তু টেনে তুলতে পারছি। উঠে আসা ভিজে রশি কব্জি খেলিয়ে কাঁধে ফেলে নিয়ে সাজিয়ে রাখছি কয়েল করে।

বোটের পাশে পানির ওপর উঠে এল সবুজ ক্যানভাস, ঝুঁকে পড়ে রশির গিঁটটা শক্ত করে ধরলাম, তারপর এক টানে বোটের ওপর তুলে এনে ছেড়ে দিলাম ককপিটের ডেকে। কার্ঠের ওপর ভারী ধাতব বস্তু পতনের ঘটনাং আওয়াজ হল।

খোলো এবার, অস্থির কর্ণে ভুকুম করল রাফেলা।

আজ্ঞে, মাদামোয়াজেল, এম্ফুনি খুলছি, নিঃশব্দে হেসে বেল্টের খোপ থেকে আমার বেইট-নাইফটা টেনে নিলাম। স্কুরের মত ধারালো এটার ফলা, একটা করে পোচ দিয়ে প্রতিটি রশি কেটে দিলাম।

ব্যগ্রভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে রাফেলা। আমি যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি সেদিকে পর্যন্ত খেয়াল নেই ওর। সবুজ ক্যানভাসটা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু চোখ ফেরাচ্ছি না ওর মুখের ওপর থেকে। স্বভাবতই আমার চেয়ে আগে দেখতে পেল জিনিসটা ও। সেটাকে চিনতে পেরেই লোভে চকচক করে উঠল চোখ দুটো, অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে দ্রুত ঢোক গিলল পর পর। দুবার-পরিষ্কার বুঝলাম, জিনিসটা যাই হোক, এটা দেখতে পাবার আশাতেই উন্মুখ হয়ে ছিল ও। কিন্তু দুসেকেন্ড পরই চোখ আর মুখে দ্রুত একটা হতাশার ভাব ফুটিয়ে তুলল।

অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে বদলে ফেলেছে রাফেলা তার মুখের ভাব, মনে মনে স্বীকার করলাম, দুর্লভ অভিনয় ক্ষমতার অধিকারিণী সে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে না থাকলে আবেগের এই এক পলকের খেলা থেকে বঞ্চিত হতাম আমি।

চোখ নামিয়ে জিনিসটার দিকে তাকালাম। পরমুহূর্তে বিস্ময়ে ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, সেই সাথে হতাশায় ছেয়ে গেল মন। যা আশা করেছিলাম তার ধারে কাছের কিছুই নয় জিনিসটা। স্তম্ভিত হয়ে ভাবছি, কি আশ্চর্য, এই নিরীহ দর্শন ঘন্টার জন্যে এতগুলো লোক খুন হয়েছে! প্লেনের কোন পার্টস নয়, জিনিসটা একটা জাহাজের ঘন্টা। ব্রোঞ্জের তৈরি, গায়ে গভীরভাবে খোদাই করা কারুকাজ, কিন্তু শরীরের অর্ধেকটার ছাল কিসে যেন কুরে খেয়ে ফেলেছে। ওপরের অর্ধেকটা যাকে তাই আছে, তবে সবুজ মরচের মোটা স্তর জমেছে গায়ে। চেইনের গিঁটগুলোয় এবং মাথার ওপরের মুকুটে খোদাই করা অলংকৃত নকশা মরচের নিচে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে-লতাপাতা এবং ফুলের আকৃতি নিয়ে আঁকাবাঁকা খোদাই করা লিপিমাল্য, সেগুলো অনিয়মিত রেখা ধরে কুরে নেয়া হয়েছে, নিচে দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল ধাতু। ওপরের দিকটা গম্বুজের মত, তার ওপর মুকুটটা। নিচের দিকটা ছড়ানো, চওড়া। একশো পাউণ্ডের কম হবে না বেলটার ওজন।

গড়িয়ে উল্টো করে দিলাম ওটাকে। প্রকাণ্ড জিভটায় শক্ত মরচে ধরেছে, এবং নানা জাতের শেলফিশ নোংরা করে গেছে গম্বুজের ভেতর দিকটা। বাইরের দিকের ক্ষয় এবং কুরে খাওয়ার ভঙ্গি দেখে অস্বস্তি বোধ করছি, এই সময় হঠাৎ রহস্যটা বুঝতে পারলাম। দীর্ঘদিন পানিতে ভোবা ধাতব বস্তু এর আগেও দেখেছি আমি। পানির নিচে বালির তলায় বেল-এর অর্ধেকটা গেঁথে ছিল, তাই অক্ষত আছে ব্রোঞ্জ, শুধু মরচে ধরেছে গায়ে। বাকি অর্ধেকটা ছিল বালির ওপর-গানফায়ার ব্রেক-এর তীব্র স্রোতের তোড় এবং সূক্ষ্ম প্রবাল কণার অবিরাম বিদ্যুৎগতি আক্রমণে ব্রোঞ্জের এক ইঞ্চির সিকি ভাগ ছাল ক্ষয়ে

গেছে। যাই হোক, বালির নিচে ঢুকে যাওয়া অংশটা অক্ষত আছে, কয়েকটা অক্ষর পড়াও যাচ্ছে পরিষ্কার। মন দিয়ে লক্ষ করছি সেগুলো।

গগুী

প্রথম অক্ষর দুটো গ, নাকি ভাঙা একটা ঘ-ঠিক বোঝা যাচ্ছে। এর পাশেই রয়েছে নিখুঁত একটা ু তারপর একটু ফাঁক রেখে গোটা ী অক্ষরটা দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তী সমস্ত অক্ষর ক্ষয়ে গেছে, চেনার কোন উপায় নেই।

ব্যারেলের উল্টোদিকের ধাতব শরীরে খোদাই করা প্রতীক চিহ্নটা অত্যন্ত জটিল একটা ডিজাইন, কালের আঁচড়ে তাও ঝাপসা হয়ে গেছে। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুটো হিংস্র পশু-সম্ভবত সিংহ-সামনের দুটো পা ব্যবহার করছে। হাতের মত, তা দিয়ে ধরে রয়েছে একটা শিল্প এবং একটা মেইল্ড হেড।

আবছাভাবে মনে হচ্ছে এর আগে কোথায় যেন দেখেছি এই প্রতীক চিহ্নটা, কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না।

ইতিমধ্যে সিঁধে হয়ে দাঁড়িয়েছে রাফেলা। আমিও দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তাকালাম। মজার ব্যাপার, তাই না? নিঃশব্দে হাসছি। একটা জেট প্লেনের নাকে ঝুলছে মস্ত একটা ব্রোঞ্জের ঘন্টা-দৃশ্যটা কল্পনা করতে পার?

এর আমি কিছুই বুঝছি না, বলল ও।

আমিও কি ছাই কিছু বুঝতে পারছি? সেলুনে ঢুকে একটা চুরুট নিয়ে ফিরে এলাম আবার, সেটা ধরিয়ে বসলাম ফাইটিং চেয়ারে।

তবু-এর বিষয়ে তোমার ধারণাটা কি জানতে চাই আমি।

কিসের ধারণা, রানা? কিছুই বুঝছি না আমি। বিশ্বাস করো।

এসো, অনুমান করা যাক, প্রস্তাব দিলাম ওকে। আমিই শুরু করছি প্রথমে।

মুখ ফিরিয়ে নিল রাফেলা, রেইলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চমৎকার নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে তুলেছে চেহায়ায়।

তুমি ভুল করেছ। পাইলট ব্রাসি কোন ফাইটার প্লেন চালাচ্ছিল না, হেসে উঠলাম আমি, চালাচ্ছিল একটা ডানাওয়ালা পেঁপে। মন্তব্য করো?

আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল রাফেলা। রানা, আমি সুস্থ বোধ করছি না। হঠাৎ মাথাব্যথা শুরু হয়েছে, বমি বমি ভাব...

কি করব তাহলে এখন আমরা?

চল, ফিরে যাই।

আরেকটা ডাইভ দেব কিনা ভাবছি-ঘুরেফিরে দেখি আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা।

না, দ্রুত বলল ও। প্লীজ, এখন নয়। বিশ্বাস করো, একটুও উৎসাহ লাগছে না। চল, ফেরা যাক। দরকার হলে ফিরে আসতে পারব আবার।

ঠিক আছে! রাজি হলাম ওর কথায়। আরেকবার ডাইভ দিয়ে লাভ নেই কোন-কিন্তু তা শুধু আমি জানি। চল, ফিরে যাই। তারপর বাড়িতে বসে এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে।

চেয়ার ছেড়ে বেলটাকে আবার ক্যানভাস দিয়ে মুড়তে শুরু করলাম।

এ কি! কি করছ আবার? উদ্বিগ্নস্বরে জানতে চাইল ও।

আর যাই করি, সেন্ট মেরীর বাজারে এটাকে নিয়ে গিয়ে লোক হাসাতে রাজি নই আমি। তুমিই তো বললে ইচ্ছে হলেই ফিরে আসতে পারব এখানে আবার। তাই সাগরের কাছেই জমা রেখে যাচ্ছি এটাকে।

তা ঠিক, একমত হল রাফেলা আমার সাথে। ঠিক বলেছ তুমি।

ঘন্টাটা পানিতে ফেলে দিয়ে নোঙর তুলতে গেলাম আমি।

গ্র্যাণ্ড হারবারে ফেরার সময় ব্রিজে রাফেলার উপস্থিতি অস্বস্তিকর লাগছে আমার। একাকী গভীরভাবে চিন্তা করতে চাইছি আমি। কিভাবে ওকে নিচে পাঠানো যায় তাই ভাবছি।

একটু পর বললাম, কফি হলে মন্দ হত না। পারবে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল ও। এবং বিদায় নিল। কিন্তু দুমিনিট পরই আবার ফিরে এল ব্রিজে। বলল, ষ্টোভ জ্বলছে না।

আগে মেইন গ্যাস সিলিণ্ডার খুলতে হবে তোমাকে, ট্যাপগুলো কোথায় বলে দিলাম ওকে। কাজ শেষ করে ওগুলো বন্ধ করতে ভুলো না যেন আবার, তা নাহলে গোটা বোট একটা গ্যাস বোমা হয়ে যাবে।

ওর তৈরি কফি বিশ্বাস লাগল মুখে।

গ্র্যাণ্ড হারবারে ফিরতে সন্ধ্যা উতরে গেল। জেটি থেকে অনেকটা দূরে নোঙর ফেললাম জলকুমারীর। ডিঙি নৌকায় চড়ে ফিরে এলাম জেটিতে। রাফেলাকে পিকআপে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিলাম হিলটনের গेट পর্যন্ত। ভেবেছিলাম গলা ভেজাবার জন্যে নিজের কামরায় নিয়ে যাবে আমাকে, কিন্তু ওর তরফ থেকে কোন অনুরোধ এল না। তবে আমার ঠোঁট ভিজিয়ে দিল চুমু খেয়ে। ভারলিং, আজ রাতটা একা থাকতে দাও আমাকে। ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি। এখন গিয়ে বিছানায় উঠব। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে দাও আমাকে, তারপর যখন সুস্থ বোধ করব দুজন মিলে গুছিয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করা যাবে।

এখান থেকে তুলে নেব তোমাকে-কখন, বলো?

না, বলল ও। বোটে দেখা করব তোমার সাথে আমি। সকালে। আটটার সময়। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি। বোটে। একা। শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়-কেমন?

আটটার সময় জেটিতে নিয়ে আসব জলকুমারীকে, জানালাম ওকে।

ফেরার পথে গলা ভেজাবার তাগিদ অনুভব করলাম। লর্ড নেলসনের সামনে পিকআপ থামিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

সমবয়েসী একদল ছেলেমেয়েকে নিয়ে ল্যাম্পনি আর জুডিথ মহা শোরগোল জুড়ে দিয়েছে একটা বুথে। শালা বস্! এদিকে পায়ের ধুলো ফেলতে মর্জি হোক! চাঁচিয়ে উঠল ল্যাম্পনি। আর জুডিথ তার চুলের বেণী দুলিয়ে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল দুহাত দিয়ে। মিস্টার রানা, আজ আমরা আপনাকে খুব খাতির করব! কেন, তা একটু পরই জানতে পারবেন।

বুথের ভেতর টেনে নিয়ে গিয়ে ল্যাম্পনির পাশে বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে আমাকে, কিন্তু বাদ সাধল ল্যাম্পনি। শালা বসকে মেয়েদের মাঝখানে বসাও।

দুই দ্বীপবাসিনী মেয়ের মাঝখানে বসলাম আমি। সবার জন্যে এক পাইন্ট করে পানীয় আনালাম।
কি ব্যাপার, জুড়িথ?

আমার প্রশ্নের উত্তরে জুড়িথ নয়, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ল্যাম্পনি। হেই স্কিপার, পিকআপটা
আজ রাতে তোমার লাগছে নাকি?

লাগছে, বললাম আমি। ও-ই তো আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কি বলতে যাচ্ছে ল্যাম্পনি,
পরিষ্কার অনুমান করতে পারছি। ও সব-সময় এমন ভাব দেখায় যেন গাড়িটায় ওর ভাগ আছে।

সাউথ পয়েন্টে আজ রাতে বিরাট উৎসব আছে, বস, হঠাৎ বসের আগে শালাটাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ
করেছে ল্যাম্পনি, অত্যন্ত সম্মানের সাথে স্কিপার, বস, স্যার ইত্যাদি সম্বোধন উচ্চারণ করছে সে।
টার্কেল বে-র কাছে তোমাকে যদি পৌঁছে দিই, অনায়াসে রাতের জন্যে ট্রাকটা ব্যবহার করতে পারি
আমরা, স্যার। প্রতিজ্ঞা করছি কাল সকালে বাড়ি থেকে তুলে নেব তোমাকে, বস।

গ্লাসে শেষ চুমুক দিলাম আমি। ওরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

বিরাট একটা পার্টি, মিস্টার রানা, বলল জুড়িথ। যেতে না পারলে আফসোস থেকে যাবে, আবেদনের
প্রলম্বিত স্বরে বলল সে, প্লী-ই-জ!

সকাল সাতটায় তুলে নেবে আমাকে, শুনতে পাচ্ছ, ল্যাম্পনি?

একসাথে হেসে উঠল ওরা সবাই। তারপর আমাকে এক পাইন্ট খাওয়ার জন্যে চাঁদা তুলতে শুরু
করল।

.

ভাল ঘুম হল না রাতে। কয়েকবার জেগে উঠলাম, ঘুমের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা অস্থিরতা অনুভব
করলাম এবং স্বপ্ন দেখলাম বার দুয়েক। আমি যেন পানিতে ডুব দিয়ে তুলে নিয়ে এসেছি সবুজ
ক্যানভাসে মোড়া প্যাকেটটা, সেটা খুলতেই বেরিয়ে এল রাফেলা, সে আমাকে একটা জেট ফাইটার
এয়ারক্রাফট দিল, কিন্তু হাতে নিতেই প্লেনটা একটা সবুজ পেঁপে হয়ে গেল। পেঁপের গায়ে তামাটে
আঁচড়ের দাগ, ভাল করে লক্ষ্য করতেই অক্ষরগুলো চিনতে পারলাম আমিঃ

গগুী

মাঝরাতের পর তুমুল বৃষ্টি এল, সেই সাথে বিদ্যুৎ চমকতে শুরু করল। বিদ্যুতের আলোয় বৃষ্টির পর্দার ওপারে পাম গাছের মাথা আর সৈকত দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। ভোরে যখন সৈকতে এলাম তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বড় বড় ফোঁটাগুলো উদাম শরীরে লেগে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। স্নান আলোয় কালো দেখাচ্ছে সাগরটাকে, তাকিয়ে দেখি সেই দূর দিগন্তরেখা পর্যন্ত ঝরছে বৃষ্টির ধারা। সাগরকে আলিঙ্গন করে অনেক দূর। পর্যন্ত গেলাম আমি-একা। রীফ ছাড়িয়ে আরও বহু দূর পর্যন্ত সাঁতার কাটলাম, তারপর ফিরে এলাম ধীরে ধীরে। অন্যান্যদিন এই পরিশ্রমের ফলে শরীর তাজা হয়ে ওঠে, আশ্চর্য একটা স্মৃতি আর উদ্যম অনুভব করি-আজ তা হল না। নীল হয়ে গেছে শরীর, ঠাণ্ডায় কাঁপছি। অস্বস্তি এবং অনিশ্চয়তার একটা ভারী চাপ দমিয়ে রেখেছে আমাকে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করেছি, এই সময় কাদা ছড়াতে ছড়াতে এসে পৌঁছুল পিক-আপটা। এখনও জ্বলছে হেডলাইট দুটো। হেই, শালা বস, তুমি রেডি? গাড়ির ভেতর থেকে হাঁক ছাড়ল। ল্যাম্পনি।

তালপাতার টোপা মাথায় দিয়ে বৃষ্টিতে নামলাম, গাড়িতে উঠে। সেটাকে ঝুলিয়ে দিলাম বাগানের গেটের গায়ে। ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে ল্যাম্পনির মুখ থেকে, অকারণে হাসছে সে, চোখ দুটো এখনও একটু ঝাপসা।

আমি চালাব, ওকে বললাম।

দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে যাবার পথে গতরাতের পার্টি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করল ল্যাম্পনি। ও যা বলল তার পঞ্চাশ ভাগও যদি সত্যি হয় তাহলে। ধরে নেয়া যেতে পারে নয় মাস পর সেন্ট মেরী দ্বীপে মহামারির আকারে সদ্যোজাত শিশুর প্রকোপ দেখা দেবে।

অন্যমনস্কভাবে শুনছি ওর কথা। অদ্ভুত সেই অস্বস্তি আর খুঁতখুঁতে ভাবটা শহরে চুকে আরও যেন বেড়ে গেছে আমার মধ্যে।

হেই, বস্, ছেলেমেয়েরা পিকআপ ধার দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিতে বলেছে তোমাকে...

ঠিক আছে, ল্যাম্পনি।

জুড়িথকে আমি জলকুমারীতে পাঠিয়ে দিয়েছি, বস্। সব গোছগাছ করে রাখবে ও। তোমার জন্যে কফিও তৈরি করে রাখবে।

তার কি দরকার ছিল?

ও নিজেই আগ্রহ দেখাল। গাড়িটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল কিনা। বলল, তোমার বসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দরকার।

ও খুব ভাল মেয়ে, অন্তর থেকে বললাম আমি।

ভালবাসি, খুব ভালবাসি ওকে, বলেই গান ধরল ল্যাম্পনি, আই লাভ দ্যাট গার্ল...

পাহাড় সারি পেরিয়ে উপত্যকায় নামার সময় হঠাৎ প্রচণ্ড একটা কৌতূহলে আক্রান্ত হলাম আমি। সোজা ফ্রিশার স্ট্রীটে নেমে বন্দরের দিকে যাবার কথা, কিন্তু তা না গিয়ে বা দিকে বাঁক নিয়ে পাক খেয়ে উঠে যাওয়া রাস্তাটা ধরলাম। দুর্গ আর হাসপাতাল ছাড়িয়ে পাহাড় ঘেরা চৌরাস্তায় পৌঁছুলাম, ওখান থেকে হিলটনের দিকে। গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে রিসেপশনে ঢুকলাম। এত সকালে কেউ নেই কোথাও, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে তাকলাম টেলিফোনরুমে। সুইচবোর্ডের সামনে বসে আছে মারিয়া।

আমাকে দেখে হাসল ও। এয়ারফোন দুটো কান থেকে নামিয়ে দ্রুত চলে এল কাউন্টারের সামনে। হ্যালো, মিস্টার রানা।

হ্যালো মারিয়া, মিস রাফেলা তার কামরায় আছেন কিনা জানো?

মুখের ভাব বদলে গেল মারিয়ার। উনি তো এক ঘন্টা আগে চলে গেছেন, মিস্টার রানা।

চলে গেছেন? মারিয়ার মুখের ওপর স্থির হয়ে গেল আমার দৃষ্টি।

হ্যাঁ। হোটেলের বাস ওকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এয়ারপোর্টে। সাড়ে সাতটার প্লেন ধরার কথা ওর। সস্তা দামের জাপানী রিস্টোঁয়াচটা চোখের সামনে তুলল মারিয়া। দশ মিনিট আগে টেক-অফ করেছে প্লেন।

হতভম্ব হয়ে গেছি। এভাবে চলে যাবে রাফেলা তা আমি ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এর কোন অর্থই বুঝলাম না, তারপর হঠাৎ করেই হ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুক। ভয়ে কঁকড়ে উঠল কলজেটা।

ওহ, মাই গড! নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলাম আমি। জুড়িথ! মারিয়ার হতভম্ব চেহারার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এলাম হোটেলের বাইরে।

আমাকে দেখেই গান থেমে গেল ল্যাম্পনির কণ্ঠে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। গাড়ির খোলা দরজার দিকে লাফ দিলাম আমি, ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিলাম ইঞ্জিনে। পা দিয়ে পেডাল চেপে রেখে বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে বাক নিলাম।

কি ব্যাপার, বস? তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে আমাকে ল্যাম্পনি।

জুডিথ? জানতে চাইলাম গম্ভীরভাবে। কখন ওকে বোটে পাঠিয়েছ-কতক্ষণ আগে?

ওকে বোটে যাবার কথা বলে তোমাকে তুলে আনতে গিয়েছিলাম। কেন, বস?

তুমি চলে আসার পরপরই কি রওনা হবার কথা ওর?

না। গোসল করে তারপর রওনা হবার কথা। কিছুই চেপে রাখছে না ল্যাম্পনি। রাতে একসাথে শুয়েছে ওরা, অন্য সময় হলে এ-খবরটা আমার কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করত। পরিস্থিতিটা গুরুত্বপূর্ণ, এটুকু বুঝতে পারছে ও। ফার্ম থেকে রওনা দিয়ে উপত্যকা পেরোবার জন্যে হাঁটতে হবে। ঝর্নার ধারে একটা গৃহস্থ পরিবারে লজিং থাকে ল্যাম্পনি। ঝর্না থেকে বন্দর। হাঁটা পথে তিন মাইল।

খোদা, সময় থাকতে যেন পৌঁছুতে পারি! ফিসফিস করে বললাম। রাস্তা ধরে ঝড়ের বেগে উঠে যাচ্ছে পিকআপ। চৌরাস্তার কাছে বাঁক নেবার সময় এক দিকে সাংঘাতিক কাত হয়ে পড়ল গাড়ি, মুহূর্তের জন্যে মনে হল উল্টে যাচ্ছি আমরা।

হয়েছেটা কি, বস? আরেকবার জানতে চাইল ল্যাম্পনি।

বাঁক নেয়া শেষ করে সিধে করলাম গাড়ি। শহরের মাথার ওপর থেকে গোল চক্কর খাওয়া রাস্তা ধরে সগর্জনে ধেয়ে নামার সময় ওকে বললাম, জুডিথ বোটে উঠলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। যেভাবে হোক বাধা দিতে হবে ওকে।

আর কোন প্রশ্ন তুলে আমার মনোযোগ নষ্ট করল না ল্যাম্পনি। দীর্ঘদিন আমার সাথে থেকে কখন চুপ করে থাকতে হয় এবং কখন আমার নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে মনে নিতে হয় সে-বুদ্ধি অর্জন করেছে ও।

দুর্গ ছাড়িয়ে এসে গ্র্যাণ্ড হারবারের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি আমরা। দূর ব্যবধানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দ্বীপের অন্যান্য বোটের মাঝখানে এখনও নোঙর ফেলা অবস্থায় ভাসছে জলকুমারী। এবং জেটির মাথা থেকে ডিঙি নৌকো নিয়ে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে জুডিথ। এতদূর থেকেও

নৌকোর গলুইয়ে বসা নারী মূর্তিটাকে পরিষ্কার চিনতে পারছি আমি। দৃঢ় এবং হৃদবদ্ধভাবে বৈঠা চালাচ্ছে জুডিথ। দ্বীপের মেয়ে সে, একজন পুরুষ মানুষের মতই বৈঠা বায়।

ফেরানো যাবে না ওকে, বলল ল্যাম্পনি। আমরা জেটিতে পৌঁছবার আগেই বোটে উঠে যাবে ও।

ফ্রিশার স্ট্রীটের মাথায় পৌঁছে হর্নের বোতামে বাঁ হাতের তালু চেপে ধরলাম। কিন্তু যতই হর্ন বাজাই, রাস্তা পরিষ্কার করা অসম্ভব। আজ শনিবার, অর্থাৎ হাটবার। গ্রামবাসীরা গরুর গাড়ি আর ঠেলাগাড়ি নিয়ে নেমে এসেছে রাস্তায়। ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে জটলার মধ্যে দিয়ে ধীর গতিতে এগোচ্ছি। জেটি পর্যন্ত আধমাইল পেরোতে মূল্যবান তিনটে মিনিট খোয়ালাম আমরা।

জলকুমারীর গায়ে নৌকো বেঁধেছে জুডিথ। মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে সে। পরনে ওর এমারেন্ড গ্রীন রঙের শার্ট আর আঁটো। ডেনিম প্যান্ট। সদ্য স্নান করেছে ও, ভিজো কালো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে পিঠে। অকস্মাৎ ব্রেক কষে পাইন অ্যাপল শেডের পাশে দাঁড় করলাম গাড়ি। তারপর আমি আর ল্যাম্পনি প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম জেটির দিকে।

জুডিথ! চাঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, নিজের গলার স্বরে আতঙ্কের রেশ অনুভব করে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল আমার। কিন্তু চিৎকারটা বন্দরের ওপার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল না।

পেছন দিকে না তাকিয়ে জলকুমারীর সেলুনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল জুডিথ। উন্মাদের মত চিৎকার করছি আমরা, প্রাণপণে দৌড়ে পৌঁছে গেছি জেটির শেষ মাথায়। বাতাস ঝাপটা মারছে আমাদের মুখে, চিৎকারের আওয়াজ উল্টোমুখো বাতাসে বাধা পেয়ে পাঁচশো গজ দূরের জলকুমারী পর্যন্ত পৌঁচাচ্ছে না।

ওখানে একটা নৌকো! আমার কাঁধ খামচে ধরে টান মারল ল্যাম্পনি।

পাথরের বাঁধের গায়ে একটা রিঙের সাথে চেইন দিয়ে বাঁধা ডিঙি নৌকোটোর দিকে ছুটলাম আমরা। আট ফুট উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম গলুইয়ের ওপর দুটো ভারী বস্তুর মত। চেইনটার দিকে ডাইভ দিলাম আমি। কাঠের উঁচু-নিচু পাটাতনের সাথে ঘষা খেয়ে বুকের ছাল উঠে গেল খানিকটা। সিকি ইঞ্চি মোটা স্টীলের চেইন, রিঙের সাথে ভারী একটা তালা দিয়ে আটকানো।

চেইনটা দুই প্যাচ জড়িয়ে নিলাম কঙ্জিতে, বাধের গায়ে পা। রাখলাম একটা তারপর সবটুকু শক্তি দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারলাম। তালাটা ভেঙে যেতেই পেছন দিকে ডিঙির তলায় পড়ে গেলাম।

রো-লকে ইতিমধ্যে বৈঠা ঢুকিয়ে দিয়েছে ল্যাম্পনি।

বাও! গলার রগগুলো চামড়ার ওপর ফুলে উঠল আমার, বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে বললাম ওকে, যত জোরে পার বৈঠা বাও, ল্যাম্পনি! জলকুমারীর দিকে তাকালাম, কালো মেঘের নিচে ভীতিকর দুঃস্বপ্নের মত লাগছে ওটাকে।

বো-তে দাঁড়িয়ে হাত দুটোকে চোঙের মত করে মুখের সামনে তুলে ধরেছি আমি, নাম ধরে ডাকছি জুডিথকে, চেষ্টা করছি বাতাসের বাধা ভেদ করে চিৎকারটাকে জলকুমারী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

একাগ্রচিত্তে পাগলের মত বৈঠা চালাচ্ছে ল্যাম্পনি। ঝপাৎ করে পড়ছে বৈঠা পানিতে, পানি কাটার সময় গলুইয়ের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ছে সে, পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের মত উঠে বসে ঝুঁকে পড়ছে সামনের দিকে। হাপরের মত শব্দ করে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে তার নাক দিয়ে প্রতিবার বৈঠা ফেলার সময়।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছি, এইসময় ঘিরে ফেলল আমাদেরকে আরেক দফা তুমুল বৃষ্টি। মুখে আঘাত করছে বড় বড় ফোঁটা, চোখ ঝুঁচকে তাকিয়ে আছি জলকুমারীর দিকে।

ধূসর বৃষ্টির ঝালর প্রায় ঢেকে রেখেছে সামনেটা, সাগরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে জলকুমারীর দেহরেখা। তবে দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব। আশা করতে শুরু করেছি গ্যালিতে ঢুকে গ্যাসের চুলোয় আগুন ধরাবার আগে নিশ্চয়ই জুডিথ ঝাড়া-মোছা আর গোছগোছের কাজ সারবে। ভাবছি, আমার আশঙ্কা যেন মিথ্যে হয়। রাফেলা আমার জন্যে একটা বিদায় উপহার রেখে গেছে, আমার এই ধারণা যেন ভুল হয়।

তবু গত সন্ধ্যায় রাফেলাকে বলা আমার কথাগুলো স্পষ্ট বাজছে কানে। আগে মেইন গ্যাস সিলিণ্ডারটা খুলতে হবে তোমাকে। কাজ শেষ করে ওগুলো বন্ধ করতে ভুলো না যেন আবার, তা নাহলে গোটা বোট একটা গ্যাস বোমা হয়ে যাবে।

জলকুমারীর আরও কাছে চলে এসেছি, কিন্তু এখনও ঝাপসা দেখাচ্ছে তাকে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর শেষ মাথায় ঝুলছে যেন, পাক খেয়ে নেমে আসা কুয়াশার ভেতর কি এক অচেনা অপার্থিব সাদা বস্তু।

জুডিথ! এখন আমার চিৎকার শুনতে পাবার কথা জুডিথের, এতটা কাছে চলে এসেছি আমরা। পঞ্চাশ পাউণ্ডের দুটো গ্যাস। সিলিণ্ডার রয়েছে বোটে, বড়সড় একটা ইট-সিমেন্টের তৈরি বাড়ি ধূলিসাৎ করার জন্যে যথেষ্ট। বাতাসের চেয়ে বেশি ভারী গ্যাস, একবার যদি বেরিয়ে আসতে পারে,

নিচে নেমে স্থির হয়ে চুপচাপ জমে থাকবে। গ্যাস আর বাতাসে ভরাট হয়ে সাংঘাতিক বিস্ফোরকে পরিণত হবে বোটের পুরো খোলটা। দরকার শুধু আগুনের একটা কণা।

জুড়ি...

অকস্মাৎ জলকুমারী এবং তার সাথে আমার মাথার ভেতরটা বিস্ফোরিত হল।

এটা একটা আগ্নেয় বিস্ফোরণ, বোট থেকে লাফ দিয়ে উঠল। গাঢ় নীল আগুনের লকলকে প্রকাণ্ড জিভ। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল খোলটা, বিকট কড়াক শব্দে দুফাঁক হয়ে গেল সুপারস্ট্রাকচার, খোলের ওপর মস্ত এক ঢাকনির মত। খুলে যাচ্ছে সেটা।

মরণ-আঘাতে ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে জলকুমারী। ঝড়ো বাতাসের মত ধাক্কা মারল আমাদের চোখেমুখে আগুনের আঁচ। বজ্রাঘাতে লোহা আর পাথর পোড়ার কটু গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। বাতাস।

আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি অসহায়ভাবে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগে মারা যাচ্ছে জলকুমারী। ছিন্নভিন্ন, প্রাণহীন খোলটা ধসে পড়েছে, ঠাণ্ডা পানি কলকল করে ঢুকে যাচ্ছে তার ভেতরে। ভারী ইঞ্জিন দুটো দ্রুত তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল পানির নিচে। এইমাত্র ছিল, কিন্তু এখন আর নেই সে, এ্যাণ্ড হারবারের ধূসর পানি গ্রাস করেছে তাকে।

বেসামালভাবে দুলছে ডিঙি নৌকোটা, আমি আর ল্যাম্পনি আতঙ্কে পাথর হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে আছি পাটাতনের ওপর, বিস্ফোরিত চোখে বিশ্বস্ত বোটের ভেঁড়াভাঙা টুকরো আলোড়িত পানিতে ভাসতে দেখছি-প্রিয় একটা বোট এবং অপরূপ এক যুবতীর এইটুকুই যা অবশিষ্ট। বিশাল এবং প্রচণ্ড ভারী একটা রিক্ততা চেপে বসেছে আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে-ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে, ঘৃণায় দুনিয়া কাঁপিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করল আমার, কিন্তু শরীরের প্রতিটি পেশী পঙ্গু হয়ে গেছে, চিৎকার করা তো দূরের কথা একচুল নড়তে পারলাম না আমি।

তীব্র একটা ঝাঁকি খেল ল্যাম্পনি, যেন এতক্ষণে বিস্ফোরণের ধাক্কাটা লাগল তাকে। লাফ দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সে, আহত পশুর মত কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। উদভ্রান্তের মত ছুটে পানিতে পড়তে যাচ্ছে সে, দেখেই বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার শরীরে। ওকে ধরে ফেললাম, নিজের বুকের সাথে পিষে ধরে রাখলাম।

ছাড়ো আমাকে, পাগলের মত আমার কপালে মাথা ঠুকছে ল্যাম্পনি। ধাক্কা লেগে মাথার ভেতর মগজ পর্যন্ত নড়ে উঠল আমার। আমি ওর কাছে যাব...আমাকে ওর কাছে যেতে দাও!

না, টালমাটাল নৌকোর ওপর ধস্তাধস্তি করছি আমরা। কোন লাভ নেই, ল্যাম্পনি।

চল্লিশ ফুট পানির নিচে জলকুমারীর বিধ্বস্ত খোল পড়ে আছে। এখন, সেখানে যদি পৌঁছুতেও পারে ল্যাম্পনি, যা দেখতে পারে তাতে পাগল না হয়ে উপায় থাকবে না ওর। বিস্ফোরণের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ছিল জুডিথ, আগ্নেয় বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কা এবং ভয়ঙ্কর উত্তাপের শিকার হয়েছে সে।

ছাড়ো আমাকে, ওর কাছে যাব আমি! একটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমার মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি চালান ল্যাম্পনি। আঘাতটা আসছে দেখতে পেয়ে দ্রুত একপাশে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম মাথাটা। নাকের পাশে লেগে পিছলে গেল ঘুসিটা। বুঝতে পারছি, এখুনি ওকে শান্ত করতে না পারলে বিপদ হবে। ল্যাম্পনিকে মরতে বা পাগল হতে দিতে পারি না আমি।

যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যাবে নৌকোটা। আমার চেয়ে চল্লিশ পাউণ্ড হালকা হলে কি হবে, বুনো ষাঁড়ের মত শক্তি এসে গেছে ওর শরীরে, পারছি না আমি ওর সাথে। জুডিথের নাম ধরে ডাকছে এখন ও।

জুডিথ! আসছি, অপেক্ষা করো...জুডিথ। ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের করে দিয়ে চিৎকার করছে ল্যাম্পনি। ওর কাঁধ খামচে ধরা ডান হাতটা তুলে নিলাম, অপর হাত দিয়ে বুকে ধাক্কা মেরে সামনে থেকে ওকে সরিয়ে দিলাম একটু, তারপর ওর বাঁ কানের নিচে মারলাম ঘুসিটা। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল সে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ধরে ফেললাম ওকে। ধীরে ধীরে নামালাম শরীরটা পাটাতনের ওপর। তারপর সুষ্ঠু ভঙ্গিতে শুইয়ে দিলাম। পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে বৈঠা চালিয়ে ফিরে এলাম জেটিতে। সম্পূর্ণ অথর্ব আর নিঃশ্বাস লাগছে নিজেকে আমার।

ল্যাম্পনিকে কাঁধে ফেলে নিয়ে জেটির শেষ মাথায় পৌঁছুলাম। ওর কোন ওজনই অনুভব করছি না আমি। ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পৌঁছুলাম হাসপাতালে। ডিউটিতে পেলাম ডাক্তার ডানিয়েলকে, কিন্তু সে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিল।

এই শেষবার বলছি, তাকে জানালাম আমি, এমন একটা ওষুধ দাও ল্যাম্পনিকে যাতে চব্বিশ ঘন্টার আগে ঘুম না ভাঙে ওর। কেন, সে-কথা জানতে চেয়ো না।

দেখ, মিস্টার রানা... আবার শুরু করল সে, ...আমি একজন সরকারী ডাক্তার, নিয়ম মেনে চলতে হয় আমাকে...

এক পা এগোলাম ডানিয়েলের দিকে। বেশ, এসো, তোমাকেই তাহলে ঘুম পাড়িয়ে দিই...

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সামনে দুহাত তুলে পিছিয়ে গেল সে, কাঁপা গলায় ডিউটি সিস্টারকে ডেকে
ইঞ্জেকশন আনতে পাঠিয়ে দিল।

তিন

পরদিন দুপুরের একটু আগে হিলটনে গেলাম। আমাকে দেখে সুইচবোর্ডের কাছ থেকে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল মারিয়া, কান থেকে গলায় নামিয়ে নিল এয়ারফোন দুটো।

ভদ্রমহিলা সুইমিং পুলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, মিস্টার রানা, বলল সে।

পানিতে নামতে হবে নাকি?

হেসে ফেলল মারিয়া। নামতে বললে সুযোগটা ছাড়বেন না, বলল সে। প্রকাণ্ড একটা লাল আমব্রেলার ছায়ায় পাবেন ওকে। স্বর্ণকেশী, পরনে হলুদ বিকিনি।

সান কাউচে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা, একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। পেছন থেকে তার একরাশ সোনালি চুল দেখতে পাচ্ছি, সিংহের ঝুঁটির মত, সরু আর লম্বা করে কিছুটা বাধা, তারপর ডেউ খেলানো অসংখ্য ফিতের মত ছড়িয়ে পড়ছে পিঠের ওপর।

সুইমিং পুলে লোকজন নেই বললেই চলে। পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, চোখ থেকে সানগ্লাসটা ঠেলে তুলে দিল একেবারে চাদির মাঝখান পর্যন্ত, তারপর শরীরটাকে অদ্ভুত এক মোচড় দিয়ে একটা মাত্র ঝাঁকিতে দুপায়ের ওপর সটান সিঁধে হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা ছোটখাট, আমার বুক পর্যন্ত উঠেছে মাথাটা। পরনের বিকিনিটাও খুব ছোট, গভীর একটা নাভি এবং মসৃণ, সমতল তলপেট, মৃদু রোদে পোড়া সুগঠিত কাঁধ, ছোট ছোট বুক, আর চিকন একটা কোমর-সবই চোখে পড়ছে। পা দুটো মেদহীন, পাতা দুটো খোলা একজোড়া স্যাণ্ডেলে ঢোকানো আঙুলের নখের সাথে মিল রেখে পায়ের নখগুলোও পরিষ্কার লাল নেইল পলিশে রাঙানো। কাঁধ থেকে চুল সরাবার সময় তার হাসি এবং সুগঠিত ছোট দুটো হাত লক্ষ করলাম।

খুব বেশি মেকআপ ব্যবহার করেছে মেয়েটা, কিন্তু ব্যবহারের দুর্লভ নৈপুণ্যে তা কোথাও ছোপ-ছোপ দাগ রাখেনি, বরং মুক্তোর। মত কোমল ঝকঝকে হয়ে উঠেছে চামড়া এবং রঙ, যেন গাঢ় আগুনের মত জ্বলছে দুই গালে, ঠোঁট জোড়ায়। চোখে দীর্ঘ, কালো আই-ল্যাশ টেনেছে ও, এবং চোখের পাতা দুটোয় বেগুনির। সাথে সোনালী রঙ মিশিয়ে লেপেছে।

পালাও রানা! মনের ভেতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিল আমাকে। এ-ধরনের মেয়ে আগেও দেখেছি আমি। চেহারাটা ছোট হলে কি হবে, চুঁচালো দাঁত আর ধারালো নখর বিশিষ্ট হিংস্র বিড়ালের মত এরা-এদের তৈরি বেশ কিছু দাগ রয়েছে আমার শরীরে ও মনে। কিন্তু পিছু হটলাম না।

সাহসের সাথে এগিয়ে গেলাম আমি, মুখের ভেতর জিভ নেড়ে আর চোখ দুটো টান টান করে ভুবনভোলানো হাসিটা ছাড়লাম, জানি এই হাসিতেই ঘায়েল হয় এরা, ডিনামাইটের মত বিস্ফোরণে নুখ হয়ে ওঠে।

হ্যালো, বললাম ওকে। আমি মাসুদ রানা।

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির সর্বত্র মেয়েটার বিলোল কটাক্ষ অনুভব করলাম। মাথা থেকে আমার চোখে নেমে এসে স্থির হল ওর দৃষ্টি। নিচের ঠোঁটটা সামান্য একটু চুষে নিল ও, তারপর বলল, হ্যালো, কণ্ঠের সুরটা কৃত্রিম লাগল কানে, যেন ঠিক এই ভঙ্গিতে উচ্চারণ করার জন্যে রিহার্সেল দিয়ে রেখেছে, এবং একই নিঃশ্বাসে বলল, রাফেলা বার্ড-নিরোর বোন।

বার্ড? বিবাহিতা...?

না, বলল মেয়েটা। বার্ড আমাদের পৈত্রিক উপাধি। কিন্তু বাবার সাথে রাগ করে বার্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে উপাধিটা ত্যাগ করেছিল নিরো।

অসুগামী সূর্যের রশ্মি পামগাছের মাথার ওপর দাবানলের লালিমা ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার বাড়ির বারান্দায় বসেছি আমরা, আদি মাতা সাগরের একটানা তর্জন-গর্জন শুনছি আর নিবুম গোধূলি উপভোগ করছি। ফলের রস আর বরফের সাথে হালকা শ্যাম্পেন খেতে দিয়েছি ওকে। চিঠিটা দিয়ে উঠে গেছে ও, আমার দিকে পেছন ফিরে বারান্দার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙে ভর দিয়ে। কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো স্বচ্ছ নাইলনের একটা ফ্রক পরে রয়েছে ও, হাঁটুর অর্ধেকটা কোনমতে ঢাকা পড়েছে তাতে, পুরো বুক প্রায় সবটা খোলা। ফ্রকের নিচে আর কিছু পরেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।

চিঠিটা সম্ভবত নিজের পরিচয়পত্র হিসেবে দেখতে দিয়েছে আমাকে ও। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বোনের কাছে লেখা নিরোর চিঠি এটা। হাতের লেখাটা পরিষ্কার চিনতে পারছি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক তরুণ অ্যাডভেঞ্চারিস্টের উচ্ছ্বাসে ভরা চিঠি। পড়তে পড়তে নিরোর বোনের অস্তিত্ব ভুলে গেলাম আমি। লিখেছে বোনকে, কিন্তু ভঙ্গিটা প্রিয় বন্ধুকে লেখার মত। বোঝা যায় অত্যন্ত মধুর এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল রাফেলার সাথে তার। চিঠিটা বেশ বড়। অভিযানের অনেক খবর রয়েছে এর মধ্যে, কিন্তু সবই আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছে নিরো, কোথাও রহস্য পরিষ্কার করেনি। এক জায়গায় লিখেছে অভিযান সফল হলে টাকা-পয়সার কোন অভাব থাকবে না তাদের এবং জীবন হয়ে উঠবে সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দে ভরপুর।

বোনকে নিয়ে সুখ এবং সমৃদ্ধি চেয়েছিল যে ছেলেটি সে আজ সাগরের অতলতলে ঘুমিয়ে আছে ভাবতে গিয়ে বুকটা টনটন করে উঠল আমার। তার মৃত্যুটা ব্যক্তিগত ক্ষতির মত লেগেছিল আমার কাছে। যাই হোক, হঠাৎ চিঠিতে আমার নামটা লাফ দিয়ে উঠল। ...ভদ্রলোককে পছন্দ না করে পারবে না তুমি, রাফেলা। পাষাণের মত কাঠিন্য আছে চেহারা, সাগরের গভীরতা আছে। ব্যক্তিত্বে, আমাদের গলিতে রোজ রাতে যে ছোকরা বিড়ালটা বেরিয়ে আসে মারামারি করার জন্যে, ঠিক তার মত জেদী এবং ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু এসবের নিচে অদ্রুত কোমল একটা মন আছে ভদ্রলোকের, আশ্চর্য সুন্দর একটা মন। মনে হয় আমাকে তার ভাল লেগেছে। জানো, কি করলে ভাল হবে সে বিষয়ে উপদেশ দেয় আমাকে...

তাড়াতাড়ি হুইস্কির গ্লাসটা এক ঢোকে নিঃশেষ করলাম আমি। চিঠির অক্ষরগুলো ঝাপসা লাগছে। দ্রুত শেষ করে ভাঁজ। করলাম চিঠিটা।

ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে রাফেলা। চেয়ার ছেড়ে উঠে। দাঁড়ালাম। চিঠিটা তার হাতে দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গেলাম রেলিঙের সামনে। সাগরের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম ধীরে ধীরে। দিগন্তরেখার নিচে টুপ করে নেমে গেল সূর্য। হঠাৎ ঠাণ্ডা এবং সন্ধ্যা নামল হারবারে।

ফিরে এসে ল্যাম্পটা জ্বাললাম, দুজনের মাথার বেশ একটু ওপরে রাখলাম সেটা যাতে কারও চোখে আলোটা না পড়ে। রেইলের কাছ থেকে নিঃশব্দে লক্ষ করছে আমাকে রাফেলা।

গ্লাসে আরেকটু হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বেতের চেয়ারে হেলান দিলাম।

বুঝলাম, ওকে বললাম আমি, নিরোর বোন তুমি। সেন্ট। মেরীতে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ। কেন?

ওকে তোমার ভাল লেগেছিল, তাই না? জানতে চাইল ও। এগিয়ে এসে বসল আমার পাশের চেয়ারটায়।

অনেক লোককেই ভাল লাগে আমার। এটা আমার একটা দুর্বলতা।

ওর মৃত্যুটা কি...মানে, খবরের কাগজে যা লিখেছে, ব্যাপারটা কি ঠিক সেইরকমই?

হ্যাঁ।

এখানে কি করতে এসেছিল সে-সম্পর্কে ও কিছু বলেছিল তোমাকে?

মাথা নাড়লাম। সাংঘাতিক সতর্ক ছিল ওরা। তাছাড়া আমি কোন প্রশ্ন করিনি ওদেরকে।

গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে নিচের ঠোঁটটা জিভের ডগা দিয়ে চেটে নিল রাফেলা। তোমাকে একটা গল্প শোনাতে চাই আমি, চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। কাউকে বিশ্বাস হলেই শুধু এ গল্প শোনানো চলে। নিরো তোমার প্রশংসা করেছে, সুতরাং তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু.. মত পাল্টাল রাফেলা, ...না, ব্যাপারটা তাও নয়-আসলে কাউকে বিশ্বাস হলেও তাকে এ গল্প শোনানো চলে না, যদি না সে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক কিছু জেনে ফেলে।

আরও সহজ এবং সংক্ষেপে বলতে পার।

আসলে তিনটে কারণে গল্পটা তোমাকে শোনাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বলল রাফেলা। এক, আমার ভাইয়ের বিশ্লেষণ মেনে নিয়ে তোমাকে একজন সৎ লোক বলে গ্রহণ করেছি। দুই, যতটুকু জানো বলে স্বীকার করছ তার চেয়ে বেশি জানো তুমি, অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি। তিন, তোমার সাহায্য দরকার আমার। এবার বলি গল্পটা, কেমন?

গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে।

পোগো স্টিক-এর নাম শুনেছ কখনও তুমি? জানতে চাইল ও।

কেন শুনব না, বাচ্চাদের একটা খেলনার নাম ওটা।

হ্যাঁ, বাচ্চাদের একটা খেলনার নাম। কিন্তু এটা আবার মার্কিন নৌ-বাহিনীর পরীক্ষামূলক একটা ফাইটার এয়ারক্রাফটের কোড নেমও বটে, তাই না? যে-কোন আবহাওয়ায় খাড়াভাবে টারমাক ত্যাগ করে আকাশে উঠে যাবে এমন একটা ফাইটার এয়ারক্রাফট নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে ওরা।

ও, হ্যাঁ-মনে পড়ছে। এ সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিনে একটা। আর্টিকেল পড়েছিলাম বটে। সিনেটে প্রশ্ন উঠেছিল। বিশদ কিছু। মনে নেই।

এয়ারক্রাফটটার মান বাড়াবার জন্যে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সিনেট এর। বিরোধিতা করে।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে।

দুবছর আগে আগস্ট মাসে পোগো স্টিক-এর একটা প্রোটোটাইপ ভারত মহাসাগরের রায়ানো এয়ারফোর্স বেস থেকে টেক-অফ করে। এতে ছিল ভূমি থেকে ভূমিতে নিষ্ক্ষেপযোগ্য চারটে কিলার হোয়েল মিসাইল, প্রতিটি ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার ওঅরহেডে সজ্জিত...।

ভীতিকর একটা প্যাকেট, সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল রাফেলা। সম্পূর্ণ নতুন ধারণার ওপর। ভিত্তি করে কিলার হোয়েল মিসাইলের ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে। এটা একটা অ্যান্টি-সাবমেরিন ডিভাইস, যার কাজ পানির ওপর ভাসমান বা ডুবো-নৌযান খুঁজে বের করা এবং ধাওয়া করা। আকাশ থেকে নেমে এসে একটা এয়ারক্রাফট। ক্যারিয়ারকে ধ্বংস করতে পারে, আবার প্রয়োজনে পানিতে এক হাজার ফ্যাদম পর্যন্ত নেমে গিয়ে আঘাত করতে পারে শত্রু। সাবমেরিনকে।

সাংঘাতিক, আরও দুটোক হুইস্কি খেলাম আমি। গুরুতর বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এখন আমরা।

সে-বছরের ষোলই আগস্টের কথা মনে আছে তোমার-এদিকে ছিলে তখন?

হিলাম, কিন্তু তারপর অনেকদিন পরিয়ে গেছে। তুমি বরং মনে করিয়ে দাও সব।

ছোট্ট দুটো শব্দ উচ্চারণ করল রাফেলা, সাইক্লোন সিনথিয়া।

গড, অফ কোর্স-সে কি ভোলার কথা! দ্বীপটাকে প্রচণ্ড এক নাড়া দিয়ে গিয়েছিল সাইক্লোনটা সেবার। ঘন্টায় দেড়শো মাইল ছিল বাতাসের গতিবেগ। আমার এ-বাড়ির চাল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর গ্র্যাণ্ড হারবার থেকে প্রায় নোঙর ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিল জলকুমারীকে। ভারত মহাসাগরের এদিকটায় এ ধরনের সাইক্লোন প্রায়ই আঘাত হানে।

টাইফুনটা হামলা চালাবার কয়েক মিনিট আগে পোগো স্টিক রায়ানো এয়ারফোর্স বেস থেকে আকাশে ওঠে। টেক অফ-এর বারো মিনিট পর সিট ইজেক্ট করে বেরিয়ে আসে পাইলট, এবং চারটে নিউক্লিয়ার মিসাইল সহ সাগরে গিয়ে পড়ে প্লেনটা। প্লেনের ফ্লাইট রেকর্ডার প্লেনেই রয়ে যায়। রায়ানো বেস-এর রাডার টাইফুনের হামলায় অচল হয়ে পড়ে, তারা অনুসরণ করছিল না।

শেষ পর্যন্ত একটা আকার নিচ্ছে বিষয়টা।

কিন্তু এসবের সাথে নিরোর কি সম্পর্ক?

হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল রাফেলা। থামো, বলল সে, তারপর আবার নিজের বক্তব্য শুরু করল। খোলা বাজারে ওই কার্গোর দাম কি হতে পারে সে-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে?

একটু চিন্তা করে বললাম, পঁচিশ-ত্রিশ লাখ ডলার হতে পারে। মুখ থেকে আনুমানিক দামটা বেরিয়ে যাবার পর টনক নড়ল আমার। মাই গড! এ তো মোটা টাকার ব্যাপার স্যাপার! পুরোদমে এক্সারসাইজ চালিয়ে যাচ্ছি, প্রতিদিন আরও শক্তি বাড়ছে শরীরে-সুতরাং সচেতন এবং উৎসাহী হয়ে উঠলাম আমি। তারপর?

আমার উৎসাহ লক্ষ করে একটু হাসল রাফেলা, কিন্তু সেটা বিজয়িনীর হাসি তা চিনতে ভুল হল না আমার।

ওগুলোর মোট দাম খোলাবাজারে আরও অনেক বেশি, বলল সে। যাই হোক, প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

সিগারেট? প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

ওরটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরলাম আমি।

পোগো স্টিকের টেস্ট পাইলট ইউ. এস. নেভির একজন। কমান্ডার ছিল, তার নাম উইলিয়াম ব্রাসি। প্লেনটা পঞ্চাশ হাজার ফুট ওপরে থাকতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়, টাইফুনের সীমানা ছাড়িয়ে উঠে যাবার ঠিক আগে। প্লেনটা পড়তে শুরু করলেও সিট ইজেক্ট করেনি উইলিয়াম ব্রাসি অত্যন্ত দক্ষ এবং বিচক্ষণ পাইলট সে, প্লেনটাকে বাঁচাবার জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু সাগর থেকে পাঁচশো ফুট ওপরে থাকতে সে বুঝতে পারে তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। অগত্যা ইজেক্ট করে সে, এবং প্লেনটাকে পানিতে ডুবে যেতে দেখে।

আশ্চর্য সতর্কতার সাথে কথা বলছে রাফেলা। প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার এবং নিখুঁতভাবে উচ্চারণ করছে-ওর মুখে যদিও কেমন বেমানান লাগছে শব্দগুলো। মেয়েদের মুখে এ-ধরনের টেকনিক্যাল শব্দ একটু বিদঘুটেই লাগে। কোথাও থেকে শিখেছে এগুলো ও, এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। কার কাছ থেকে? নিরো? নাকি অন্য কেউ?

শোন, রানা, শুনে যাপ-নিজেকে বললাম আমি-শোন এবং শেখ। ভবিষ্যতে কাজে দেবে।

টাইফুন বিস্ফুর্ত সমুদ্রে তিনদিন ভেসে ছিল ব্রাসি, তারপর তাকে একটা উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার দেখতে পেয়ে রাবারের ভেলা থেকে তুলে নেয়। এর মধ্যে চিন্তাভাবনা করার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল সে। কার্গোর

মূল্য সম্পর্কেও মাথা ঘামায় সে-এবং একজন কমান্ডার হিসেবে তার বেতনের সাথে ওই মূল্যমানের তুলনা করে মন খারাপ হয়ে যায় ওর। ভালভাবে বেঁচে থাকতে হলে প্রচুর টাকা দরকার, সিদ্ধান্ত নেয় সে এবং ঠিক করে কপালগুণে যে সুযোগ সে পেয়েছে সেটাকে কোনমতে হাতছাড়া করবে না। তাই তদন্ত কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় কয়েকটা মূল্যবান তথ্য, যা শুধুমাত্র সে-ই জানত, চেপে যায় সে। তার মধ্যে একটা তথ্য হল, তীরের কোথাও থেকে দেখা যায় সাগরের এমন এক এলাকায় পোগো স্টিক ডুবেছে, এবং প্যারাসুট নিয়ে সাগরে পড়ার আগে নির্দিষ্ট কিছু চিহ্ন দেখে এলাকাটা চিনে রেখেছিল সে।

রাফেলার গল্পে কোথাও খুঁত বা অসামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছি না। শুনতেও দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে।

তদন্ত কমিশন দু'ঘণ্টানাটাকে পাইলটের গাফিলতি বলে রায় দেয়, ফলে চাকরি থেকে পদত্যাগ করে ব্রাসি। এই রায়ের ফলে তার ক্যারিয়ার খতম হয়ে যায়। সে সিদ্ধান্ত নেয়, অবসর গ্রহণ করলে যে মোটা টাকা তার প্রাপ্য হত সেটা সে সরকারের কাছ থেকে আদায় করবে এবং তার বিরুদ্ধে গাফিলতির যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটাও সে মিথ্যে প্রমাণিত করবে। ইউ. এস. নেভিকে তাদের হারানো কিলার হোয়েল মিসাইল নগদ টাকা দিয়ে কিনে ফিরিয়ে নিতে এবং ফ্লাইট রেকর্ডারের এভিডেন্স গ্রহণ করতে বাধ্য করবে।

একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এবারও হাত নেড়ে চুপ করিয়ে দিল আমাকে রাফেলা।

ইউ. এস, নেভির একটা কাজ করছিল নিরো, তাদের একটা ক্যারিয়ারের খোল ইন্সপেকশন-এইসময় ব্রাসির সাথে পরিচয় হয় তার। পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়, এবং নিরোর সাথে দেখা করার জন্যে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে ব্রাসি। পোগো স্টিক উদ্ধার অভিযানে যে পরিমাণ টাকার দরকার তা ওদের কাছে ছিল না। তাই একজন আর্থিক সাহায্যকারী খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। কিন্তু এ-ধরনের ব্যাপারে তো আর তাড়াহুড়ো করে কিছু হয় না, কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়াও চলে না। তাই বেশ সময় লাগছিল কাজটায়। এই সময় এম-ফোর-এর হিথরো টার্ন অফের কাছে নিজের থাপ্পারবার্ড অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায় ব্রাসি।

গোটা ব্যাপারটাই যেন অভিশপ্ত।

তুমি ভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস রাখ, রানা? ভুরু কুঁচকে বিড়ালের মত জ্বলজ্বলে চোখে আমাকে দেখছে রাফেলা।

একেবারে উড়িয়েও দিই না, জানালাম ওকে। ওপর-নিচে মাথা দোলাল রাফেলা, যেন তথ্যটা মনে গেঁথে নিল।

এবং তারপর আবার শুরু করল সে, ব্রাসি মারা যাবার পর প্রজেক্টটা একা হাতে নেয় নিরো। একজন অংশীদারও জোগাড় করে ফেলে সে। তারা কে, কি পরিচয়-এসব কিছুই আমাকে বলতে চায়নি, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চায় তারা। তাদের সাথেই এখানে এসেছিল নিরো-বাকিটা তুমি জানো।

জানি, মেনে নিলাম আমি, সিল্কের শার্টের ওপর দিয়ে শুকনো অমসৃণ ক্ষতচিহ্নটায় আঙুল বুলালাম, শুধু পোগো স্টিক। কোথায় ডুবেছে সেটা ছাড়া।

পরস্পরের দিকে পাঁচ সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম আমরা।

তোমাকে বলেনি নিরো? অবশেষে জানতে চাইলাম।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রাফেলা।

যাই হোক, গল্পটা ইন্টারেস্টিং, নিঃশব্দে হাসলাম ওর দিকে চেয়ে। দুঃখ এইটুকু, যে সত্য-মিথ্যে জানার জন্যে চেক করার কোন উপায় নেই আমাদের।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল রাফেলা, দুপদাপ পা ফেলে বারান্দার রেইলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাত দুটো শক্ত করে বুকের সাথে আড়াআড়িভাবে বেঁধে নিল। এতই রেগে গেছে যে আমার মনে হল লেজ থাকলে ক্রুদ্ধ সিংহীর মত ঝাপটাত সেটাকে।

ও শান্ত হবার অপেক্ষায় আছি আমি। এক সময় কাঁধ ঝাঁকাতে দেখলাম ওকে। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ক্ষীণ একটু হাসল।

আমার কপালে নেই, কি আর করা! ভেবেছিলাম পুরস্কারের কিছুটা আমারও পাওয়া উচিত। নিরো আমার ভাই-এবং সে তোমাকে বিশ্বাস করেছিল বলেই অনেক আশা নিয়ে অনেক দূরের পথ পেরিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম দুজন মিলে খোটেপিটে উদ্ধার করব জিনিসটা-কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, পুরো জিনিসটা তুমি একাই যদি ভোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক, কিছুই করার নেই আমার।

মাথা নেড়ে চুলগুলো পিঠে ছড়িয়ে দিল রাফেলা, ল্যাম্পের আলোয় চক চক করছে সোনা রঙ। উঠে দাঁড়ালাম আমি।

চল, তোমাকে পৌঁছে দিই, বললাম ওকে, ওর কাঁধে হাত রাখলাম একটা।

দুই হাত তুলে দিল রাফেলা আমার ঘাড়, আঙুলের খাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে ঘাড়ের পিছনের চুলগুলো আটকে নিল। অনেক দূরের ঠিকানা আমার, রানা, ফিসফিস করে বলল সে। পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে নিচের দিকে টানছে আমার মাথা।

ওর ঠোঁট দুটো ভিজে ভিজে আর খুব নরম, জিভটা অস্থির এবং তৃষ্ণার্ত। একটু পর পিছিয়ে গেল সে, চোখে চোখ রেখে হাসল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছে, ঘন ঘন ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে।

এটা তোমার সম্পূর্ণ ব্যর্থ অভিযান তা নাইবা মনে করলে? দুহাত দিয়ে ধরলাম ওকে। শূন্যে তুলে নিতে যাচ্ছি, তার আগেই শরীর ঢিল করে দিল ও। বাচ্চা মেয়ের মত হালকা লাগছে ওকে দুহাতের ওপর। নিজেকে বঞ্চিত করতে নেই, এ শিক্ষা অনেক আগেই পেয়েছি আমি, কবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা কেউ বলতে পারে না।

ভোরের স্নান আলোয় ওকে দেখে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল আমার। মশারির ভেতর প্রকাণ্ড ডাবল বেডে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ও। মুখে লেপ্টে গিয়ে বিদ্রী দেখাচ্ছে মেকআপ। মুখ খুলে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু নাক ডাকছে মৃদু। ঝকঝকে সোনালি চুলগুলো বেয়াড়াভাবে ছড়ানো বুনো ঝোপের মত লাগছে। আজ সকালে সাংঘাতিক অশুদ্ধ লাগছে ওকে আমার, তার কারণ সম্ভবত এই যে রাতে আমি জানতে পেরেছি সত্যি সত্যি ছুঁচালো দাঁত আর ধারাল নখর আছে মিস রাফেলার এবং সেগুলো ব্যবহার করার উগ্র একটা উন্মাদনাও আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে-সে একটা স্যাডিস্ট, কামার্ত বাঘিনীর চেয়েও স্যাডিস্ট।

নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। তারপর কি মনে করে ঝুঁকে পড়লাম ওর মুখের ওপর। জেমস নিরোর চেহারার সাথে। বৃথাই মিল খুঁজছি আমি। নাক, চোখ, কপাল, ঠোঁট, চিবুকোথাও কোন মিল নেই। নিঃশব্দে সিঁধে হয়ে দাঁড়ালাম, পোশাক পরার ঝামেলায় না গিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি ছেড়ে, হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে এলাম সৈকতে।

জোয়ারে কেঁপে উঠেছে সাগর, ডাইভ দিয়ে ঠাণ্ডা পানির ভেতর দিয়ে অনেক দূর চলে এসে মাথা তুললাম, তারপর। অস্ট্রেলিয়ান ক্রল-এর ভঙ্গিতে দ্রুত সাঁতার কেটে এগোতে শুরু করলাম বে-র মুখের দিকে।

আজ সকালে ভাগ্যবান মনে হল নিজেকে, পুরানো দোস্তরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে রীফ-এর ওপারে। বোতলের মত নাক, প্রকাণ্ড শরীর, একদল ডলফিন ওরা। ছুটে আসছে এদিকে, তার মানে দেখতে পেয়েছে আমাকে। স্রোতের ওপর পিঠ তুলে, লম্বা ফিন দিয়ে পানির গাঢ় শরীর চিরে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসছে আমার দিকে।

আমাকে ঘিরে চক্কর মারছে ওরা, শিস দিচ্ছে আর নাক দিয়ে পানি ছুঁড়ছে ফোয়ারার মত। মাথার ওপর এয়ারহোলগুলো খুদে মুখের মত দ্রুত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, বিশাল মুখে স্থির হয়ে রয়েছে উপচে পড়া আনন্দের বোকা বোকা নিঃশব্দ হাসি।

দশ মিনিট আমার সাথে খুনসুটি করল ওরা, তারপর বিশালদেহী একটা মন্দা ডলফিন এগিয়ে এসে তার ডরসাল ফিনটা ধরার অনুমতি দিল আমাকে, এবং পিঠে তুলে বেড়াতে নিয়ে চলল। স্লেজে চড়ার মত, কিন্তু আরও উপভোগ্য একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, যা কোনদিন ভোলার নয়। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছে আমার বুক আর মাথায়। অফ-শোর থেকে আধ মাইল দূর পর্যন্ত নিয়ে গেল আমাকে সে, তারপর পানির প্রচণ্ড টানে তার পিঠ থেকে খসে পড়লাম আমি।

লম্বা সাঁতার কেটে অনেক দূর পাড়ি দিয়ে ফিরে আসছি। বুল ডলফিনটা আমাকে মাঝখানে রেখে বৃত্ত রচনা করে ঘুরছে, মাঝেমধ্যে বন্ধুত্বসূচক গুতো মারছে কোমরে, আরেকবার বেড়াতে যাবার জন্যে পিঠে চড়তে বলছে। রীফ-এর কাছে শিস দিয়ে বিদায় জানাল ওরা, গর্বিত ভঙ্গিতে দল বেঁধে ফিরে গেল গভীর সাগরে। তীরে পৌঁছে আশ্চর্য সুখী আর স্বাধীন বলে মনে হল নিজেকে। কোথা থেকে যেন অপার একটা আনন্দ এসে ভরিয়ে দিয়েছে আমার অস্তিত্ব। হাতটা একটু ব্যথা করছে, কিন্তু নিরাময় আর শক্তি ফিরে আসার শুভ লক্ষণ এটা।

ফিরে এসে বিছানাটা খালি এবং বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখলাম। সম্ভবত আমার দাড়ি কামাবার রেজার দিয়ে বগলের তলা কামাচ্ছে ও, ভাবলাম আমি। একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, কেননা ব্যক্তিগতভাবে স্বাভাবিক নিয়মের বিচ্যুতি আমার সহ্য হয় না। বাধ্য হয়ে অতিথিদের জন্যে নির্ধারিত শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে গায়ের লবণ ধুয়ে ফেললাম। দাড়ি কামানো হয়নি বলে পরিচ্ছন্ন ভাবটা পুরোপুরি উপভোগ করছি না, এই অবস্থায় রাস্কসের থিডে নিয়ে ঢুকলাম কিচেনে। রেফ্রিজারেটর থেকে কচি ভেড়ার মাংস, মাখন, মেইনল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা বড় জাতের আম ইত্যাদি বের করলাম। এখনও দেখা নেই রাফেলার। পাইন অ্যাপলের সাথে মাংস ভাজা শেষ করে রুটিতে মাখন লাগাচ্ছি, এই সময় কিচেনে এল ও।

এখন আবার ওকে মোহিনী দেখাচ্ছে। হাতব্যাগে সম্ভবত গোটা একটা কসমেটিক স্টোর ভরে নিয়ে এসেছে ও। চুলের সোনা রঙে চকচকে ভাবও ফিরে এসেছে আবার। হাসিটা উজ্জ্বল, মুক্তোর মত

ঝকঝকে। গুড মর্নিং, লাভার, বিলোল কটাক্ষ হেনে এগিয়ে এল সে, পায়ে পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খেল আমার বন্ধু চোখের পাতার ওপর। বন্ধু ডলফিনদের সান্নিধ্যে পরম তৃপ্তি পেয়েছি আমি এবং মেজাজটা তারপর থেকে প্রসন্ন হয়ে আছে, কিভাবে যেন সেটা ঠিক বুঝে নিয়ে ব্রেকফাস্টের সময় নানান বিচিত্র কিন্তু অশ্লীল রসিকতা করে খুব একচোট হাসাল। আমাকে রাফেলা। কফির পট নিয়ে বারান্দায় চলে এলাম আমরা।

পোগো স্টিক। কখন ওগুলো উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমরা? হঠাৎ জানতে চাইল রাফেলা।

উত্তর না দিয়ে কড়া কালো আরেক কাপ কফি ঢেলে নিলাম পট থেকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমাকে এক রাত সঙ্গ দিয়ে রাফেলা বার্ড ধরে নিয়েছে আমি তার সারা জীবনের কেনা গোলাম। বনে গেছি। শুধু তাই নয়, চারটে কিলার হোয়েল মিসাইল এবং গোপন একটা ফাইটার এয়ারক্রাফটের ফ্লাইট রেকর্ডারের মোট মূল্যের চেয়ে আমার কাছে ওর নিজের মূল্য অনেক বেশি বলে ধরে নিয়েছে।

হ্যাঁ, উত্তরে বললাম ওকে, পোগো স্টিক। অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে। কখন? কোথায় আছে বলো-এখুনি গিয়ে নিয়ে আসছি আমি।

হাত বাড়িয়ে আমার কঙ্জি চেপে ধরল ও। বিড়ালের চোখ দুটো হঠাৎ বড় বড় আর সজীব হয়ে উঠেছে। গতরাতের ঘটনাটা একটা পেরেক, নিচু কণ্ঠস্বর হিস হিস করে উঠল ওর, আমাদের দুজনকে গাঁথে ফেলেছে। বুঝতে পারছি, রানা, মাই ডারলিং, ভবিষ্যট্টা খুব জমবে আমাদের। তুমি আর আমি, নিচের ঠোঁট জিভের ডগা দিয়ে ভিজাল ও, খুব মজা হবে।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম আমি, সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি চিন্তাভাবনা করেই। বিগ গাল আইল্যান্ডের পানিতে ডোবা সবুজ ক্যানভাস মোড়া প্যাকেটে আর যাই থাক, নিশ্চয়ই গোটা প্লেনটা নেই। হয়ত প্লেনের কোন পার্টস আছে, যা দেখে প্লেনটার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যাবে। প্যাকেটে ফ্লাইট রেকর্ডার বা মিসাইলগুলোর কোন একটা থাকতে পারে না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকলেও ফিউজিলাজ থেকে রেকর্ডারটা সরাতে প্রচুর সময়ের দরকার, অতটা সময় পানির নিচে ছিল না নিরো। এবং প্যাকেটের আকার এবং আকৃতি দেখে বোঝা যায় ওতে কোন মিসাইলও থাকতে পারে না। প্যাকেটটা লম্বা আকৃতির নয়, বরং কিছুটা গোল মত।

জিনিসটা যাই হোক, ওটার ফেস ভ্যালু খুব বেশি হবার সম্ভাবনা কম। ওটা উদ্ধারের জন্যে সাথে করে যদি রাফেলা বার্ডকে নিয়ে যাই, তেমন কোন ক্ষতি দেখি না। আসল রহস্য, আদৌ যদি কোন রহস্য থাকে, গানফায়ার রীফ-এর কাছে রয়েছে-সে-জায়গায় তো আর নিয়ে যাচ্ছি না ওকে।

প্যাকেটটা উদ্ধার করার পর রাফেলা বার্ড ধরে নেবে এখানেই, এই বিগ গাল আইল্যান্ডের পানিতেই বিশ্বস্ত হয়েছে প্লেনটা। তখন ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার বিষয় হবে। এটুকুই আমার লাভ।

রানা, ডারলিং, আবার ফিসফিস করে বলল ও, ঝুঁকে পড়ল আমার গায়ে, প্লীজ। দোহাই, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর। জীবনে কখনও এতটা উতলা বোধ করিনি। তোমাকে দেখার মুহূর্তেই ফঁসে গেছি আমি, বুঝতে পেরেছি এতদিন যাকে খুঁজছি তুমিই। সেই আদর্শ পুরুষ...

ডারলিং... আবেগে গলা বুজে এল আমার। আমিও... এর বেশি কিছু বলতে হল না। জানতাম, এইটুকুতেই কাজ হবে। নিজের চেয়ার ছেড়ে আমার কোলে চলে এল ও।

তু-তুমিও? আমাকে দেখার প্রথম মুহূর্তেই? আমারই মত উতলা বোধ করছ?

দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম ওকে। ঘরে চল, বিছানায় যাই-তারপর বুঝবে কি বোধ করছি।

ডারলিং, ব্যস্তভাবে প্রতিবাদ করল ও, এখন নয়।

কেন নয়?

এখন আমাদের হাতে অনেক কাজ। পরে অনেক সময় পাব তখন বিছানা ছেড়ে না উঠলেও কিছু এসে যাবে না।

চেহারা হতাশার ভাব ফুটিয়ে কোল থেকে উঠে যেতে দিলাম ওকে। তারপর চুপিসারে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। প্রচুর ভেড়ার মাংস আর তিন কাপ কফি খাবার পর নিজেকে বনবিড়ালের হাতে ছেড়ে দিলে হার্টের কিছুটা ক্ষতি তো হতই।

চার

ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছে রডরিক, এই সময় ওর বাড়িতে পৌঁছুলাম আমি। সব কথা ব্যাখ্যা করতে মাত্র এক মিনিট লাগল। পিকআপে চড়ে দুর্গে এলাম আমরা, এবং পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত সাড়া দিল ইন্সপেক্টর টমসন। আমার বিবৃতি ফাইল করল সে, অন্যান্য পুলিশী কাজগুলো সেরে নিল। নিজে দাঁড়িয়ে থেকেট্রোকে তুলে দিল পুলিশ বিভাগের ডাইভিং ইকুইপমেন্ট। আবার যখন বন্দরে ফিরে এলাম, দেখলাম, ইতিমধ্যে শহর উজাড় করে সব লোকজন জেটির কাছে চলে এসেছে, শোকাভিভূত নিশ্চল একটা ভিড় দাঁড়িয়ে আছে জেটির দুপাশে। কেউ কেউ দৃশ্যটা চাক্ষুষ করেছে, কিন্তু বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছে সবাই।

নৌকায় ডাইভিং সরঞ্জামগুলো তুলছি আমরা। সহানুভূতিসূচক মন্তব্য করছে অনেকে। গোথালে রামাদীনকে খবর দাও কেউ, ওদেরকে বললাম আমি। একটা ব্যাগ আর একটা বাল্কেট নিয়ে এখানে আসতে বলো তাকে।

আমি থামতেই অসংখ্য প্রশ্ন উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে।

হেই, মিস্টার রানা, বোটে কেউ ছিল নাকি?

রামাদীনকে শুধু খবরটা পৌঁছে দাও, বললাম ওদেরকে।

নৌকো নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছুলাম আমরা। ইন্সপেক্টর টমসন নৌকোটাকে আমাদের ওপর স্থির করে রাখল, বন্দরের পানির নিচে নামলাম রডরিক আর আমি।

পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা হয়ে শুয়ে আছে জলকুমারী, ডোবার সময় উল্টে গেছে সে। ওর ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে কোন সমস্যায় পড়তে হল না আমাদেরকে, তার কারণ কীল-এর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দুফাঁক হয়ে খুলে গেছে খোলটা। আবার তাকে পানির ওপর ভাসাবার সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেছে।

খালের গর্ত-মুখে অপেক্ষা করছে রডরিক, আমি ভেতরে ঢুকলাম। গ্যালিতে যাও বা কিছু অবশিষ্ট আছে, সব ঢাকা পড়ে গেছে ঝাঁক ঝাঁক বুভুক্ষু মাছের ভিড়ে। গোত্রাসে খাচ্ছে ওরা। এবং কি খাচ্ছে দেখতে পেয়ে স্কুবা মাউথপীসের ভেতর দম আটকে এল আমার, কোনমতে বমি ভাবটাকে দমন করতে পারলাম।

মাংসের কণার সাথে সবুজ কাপড় না থাকলে বুঝতেই পারতাম না মাছগুলো জুড়িথের দেহাবশেষ খাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন বড় তিনটে টুকরোয় বের করে আনলাম আমরা জুড়িথকে, রামাদীনের ক্যানভাস ব্যাগে ভরা হল সেগুলো।

সাথে সাথে আবার ডাইভ দিলাম আমি, উন্মুক্ত খোলার ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে গ্যালির নিচের কমপার্টমেন্টে পৌঁছুলাম। নিজেদের বিছানায় এখনও বোল্টের সাথে আটকানো রয়েছে লম্বা গ্যাস সিলিণ্ডার দুটো। দুটো ট্যাপই খোলা, শুধু তাই নয়, স্বচ্ছন্দে গ্যাস যাতে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্যে কে যেন হোস-এর সংযোগ খুলে দিয়েছে।

অনুভব করছি, প্রচণ্ড রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আমার। সব হারাবার ফলে যে নিঃস্ব বোধ আর শোকানুভূতি আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে চেপে বসেছিল, নিমেষের মধ্যে সেই চাপ থেকে মুক্তি পেলাম আমি, তার জায়গায় অনুভব করছি শুধু অদ্ভুত একটা আক্রোশ। জলকুমারী নেই-সে ছিল আমার অর্ধেক জীবন।

ট্যাপগুলো বন্ধ করলাম আমি। গ্যাস হোস-এর বিচ্ছিন্ন সংযোগ আবার জোড়া লাগলাম। সরাসরি আমার সাথে শক্ততা করা হয়েছে-আমি ব্যক্তিগতভাবে এর প্রতিশোধ নেব।

জেটি ধরে পিকআপের দিকে হাঁটার সময় স্বস্তির সাথে ভাবছি, তবু জলকুমারীর বীমা করা আছে বলে রক্ষা। আরেকটা বোট কিনতে পারব আমি। জলকুমারীর মত অত সুন্দর বা অত প্রিয় হয়ত হবে না সেটা, তবু একটা বোট তো বটে!

পিকআপের কাছে দ্বীপবাসীরা এখনও ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকোটা কার? জানতে চাইলাম আমি। পাথরের বাঁধের সঙ্গে একটাই নৌকো ছিল, ওটাই ব্যবহার করেছি এতক্ষণ আমরা।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল প্রৌঢ় জেলে নরডিক। ঘামে ভেজা চকচকে কালো মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

নরডিক, জানতে চাইলাম, গত রাতে কাউকে তুমি জলকুমারীতে নিয়ে গিয়েছিলে?

না, স্যার, মিস্টার রানা।

মনে করে দেখ। কাউকে নিয়ে যাওনি?

শুধু আপনার মেহমানকে নিয়ে গিয়েছিলাম, মিস্টার রানা। জলকুমারীর কেবিনে রিস্টওয়াচটা ফেলে রেখে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা।

ভদ্রমহিলা?

হ্যাঁ। হলুদ চুল আছে তার, আপনার মেহমান...

কখন, নরডিক?

রাত নটার দিকে-আমি কি কোন অন্যায় করেছি, মিস্টার রানা?

না, নরডিক। ঠিক আছে। ভুলে যাও ব্যাপারটা।

পরদিন দুপুরের আগে কবর দিলাম আমরা জুডিথকে। একটু চেষ্টা করতেই ওর মা-বাবার পাশের প্লটটা ওর জন্যে ব্যবস্থা করা গেল। এতে খুশি হল ল্যাম্পনি। বলল, পাহাড়ের ওপর জুডিথ একা থাকলে খারাপ লাগত তার। ওষুধের প্রভাব থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত নয় ল্যাম্পনি, কবরের পাশে শান্তভাবে আধবোজা চোখে দাঁড়িয়ে থাকল ও।

পরদিন সকালে আমরা তিনজন উদ্ধার কাজে হাত লাগালাম। দশটা দিন হাড় ভাঙা খাটনি দিলাম, জলকুমারীর অবশিষ্ট মূল্যবান যা কিছু ছিল সব তুললাম এক এক করে। বিগ গেম ফিশিং রীল, এফ-এন কারবাইন, জোড়া ব্রোঞ্জ প্রপেলার থেকে শুরু করে। ছোরা, কোচ, দড়ি, এমন কি নাট-বল্টু পর্যন্ত কিছুই বাদ দিলাম না। কিন্তু খোল আর সুপারস্ট্রাকচার এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। যে ওখান থেকে কিছুই আমরা তুলতে পারলাম না। এই দশ দিনের শেষ দিকে প্রিয় জলকুমারী শুধু একটা স্মৃতিতে পরিণত হল। অনেক মেয়ের সান্নিধ্য পেয়েছি আমি, আজ যখন কোন একটা গানের সুর কানে বাজে বা নির্দিষ্ট কোন একটা সুগন্ধ নাকে পাই তখন শুধু মধুময় স্মৃতি হয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ফিরে আসে তারা আমার মনে। তাদেরই মত ইতিমধ্যে পিছু হটে অতীতের কোলে আশ্রয় নিয়েছে আমার জলকুমারী।

.

দশদিন পর চ্যাণ্ডা রামাদীনের সাথে দেখা করতে গেলাম আমি।

অফিসে ঢোকার মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, কোথাও একটা। সাজঘাতিক কিছু ঘটেছে। ঘামে পিচ্ছিল আর চকচকে হয়ে আছে। তামাটে মুখটা, স্টীল রিমের পেছনে কোটরে ঢোকা চোখ দুটো অস্থিরভাবে

ঘুরছে, হাত দুটো দ্রুত কচলাচ্ছে, আমাকে দেখেই আঁতকে উঠল সে, কেঁপে উঠল তার হাড়সর্বস্ব দুই কাঁধ। ও জানে জলকুমারীর বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি আমি।

হাত কচলান থামিয়ে ডেস্কটা পরিষ্কার করতে শুরু করল সে, তার মানে গোছানো ডেস্কটা অগোছাল করে তুলছে। কিন্তু কাজটা অসমাপ্ত রেখে টাইয়ের নটটা ঠিক করতে শুরু করল, সেটাও শেষ। না করে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এমন নার্ভাস হতে কাউকে কখনও দেখিনি আমি। ভগবানের দোহাই, মিস্টার রানা, স্যার-উত্তেজিত হবেন না! দ্রুত কণ্ঠে উপদেশ দিল আমাকে সে। ওর জানা নেই, এ কথা কেউ বললেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠি আমি।

ব্যাপার কি, রামাদীন? কেউ আমাকে রাগিয়ে তুললে তার প্রাপ্য সম্মানের চেয়ে বেশি সম্মান দেখাতে অভ্যস্ত নই আমি। সম্মানসূচক মিস্টার সম্বোধনটা অপব্যয় করলাম না তাই। তাড়াতাড়ি বল! কুইক! দূম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলাম ডেস্কের ওপর।

আবার আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল চ্যাণ্ডা রামাদীন। স্টীল রিমের চশমাটা নেমে এল নাকের ডগায়। মিস্টার রানা, স্যার, প্লীজ...

এই হাতুড়ে, তাড়াতাড়ি বল্ কি হয়েছে...।

মিস্টার রানা, স্যার, জলকুমারীর প্রিমিয়াম সম্পর্কে একটা ভুল...

বন করে ঘুরে গেল মাথাটা। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি।

আপনি স্যার, কখনও তো কোন ক্লেইম করেননি... মানে,...তাই আমি ভেবেছিলাম প্রিমিয়ামের টাকাটা অপচয় করার কি দরকার...

বাকশক্তি ফিরে পেলাম আমি। প্রিমিয়ামের সব টাকা মেরে দিয়েছ তুমি, জমা দাওনি? অস্ফুটে বললাম। তারমানে...তার মানে বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেবে না...।

আপনি স্যার, বুদ্ধিমান লোক, ঠিক ধরেছেন ব্যাপারটা, মাথা ঝাঁকাল চ্যাণ্ডা রামাদীন। আমি জানতাম, বুঝবেন আপনি।

সোজা এগোলাম সময় বাঁচাবার জন্যে, সামনে ডেস্ক রয়েছে। তা আমার নজরেই পড়ল না। বাধা পেয়ে সংবিৎ ফিরল, ডেস্কের ওপর উঠে পড়েছি এখন, লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়েছি প্রতিশোধের হাতটাকে। ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে পিছু হটল চ্যাণ্ডা রামাদীন, নাকি সুরে কাতর ধ্বনি ছাড়ল একটা, তারপর

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভীত সঙ্কস্ত ইঁদুরের মত ছুটে বেরিয়ে গেল পেছনের দরজা দিয়ে। ওপাশে গিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিল সে, কী-হোলে আগে। থেকে চুকিয়ে রাখা চাবিটা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল তালাটা।

ডেস্ক থেকে লাফ দিয়ে মেঝেতে, মেঝে থেকে আরেক লাফে। দরজার গায়ে গিয়ে পড়লাম। তালা ভেঙে উন্মুক্ত হয়ে গেল কবাট। দুটো প্রচণ্ড ধাক্কায়, দুপাশের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে আবার সে-দুটো ফিরে আসার আগেই প্যাসেজের অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এলাম আমি। শেষ মাথায় ছোট্ট একটা কংক্রিটের উঠান। উঠানের একধারে বাইরের গলিতে বেরিয়ে যাবার বড় একটা দরজা। দরজার দুপাশে শটকি মাছের বড় বড় কাঠের বাত্ম একটার ওপর একটা থাক দিয়ে রাখা। দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগেই ওর কাছে আমি পৌঁছে যাব বুঝতে পেরে সেই বাত্মগুলো আঁকড়ে ধরে ওপর দিকে দ্রুত উঠে যাচ্ছে ঢ্যাঙা রামাদীন, আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে সে।

নিচে দাঁড়িয়ে ওর দুটো পা ধরে ফেললাম আমি। হ্যাঁচকা টান মেরে নামিয়ে আনলাম কংক্রিটের মেঝেতে। পায়ে জোর পাচ্ছে

রামাদীন, হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে চাইছে। আমার দিকে ওকে ঘুরিয়ে নেবার সময় দেখলাম ওর দুই পায়ের মাঝখানে মেঝেতে হলদেটে পানির একটা ছোট পুকুর তৈরি হচ্ছে, ওর দুই উরুর সংযোগস্থলটা এই পুকুরের উৎস, সাদা প্যান্ট বেয়ে নামছে দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ। সম্ভবত এটা ওর একটা কৌশল, যাতে ঘৃণায় ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাই আমি। কিন্তু ওকে ছেড়ে দেবার কথা একবারও মনে হচ্ছে না আমার।

এক হাত দিয়ে শক্ত করে ধরলাম ওর সরু গলাটা। শূন্যে তুলে ফেললাম ওকে। আরেক হাত দিয়ে বুকে চাপ দিয়ে। রেখেছি, যাতে পিঠটা পেছনের কাঠের বাত্মগুলোর সাথে সঁটে থাকে।

চশমাটা পড়ে গেছে ওর নাক থেকে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে ও। বন্ধ চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি বেরিয়ে আসছে।

বুঝতে পারছ আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি? অস্ফুটে বললাম ওকে।

দুর্বোধ্য আওয়াজ করে গুণ্ডিয়ে উঠল রামাদীন। মেঝে থেকে ছয় ইঞ্চি ওপরে নাচছে ওর দুই পা।

ডান হাতটা মুক্ত করলাম আমি, শরীরের সবটুকু শক্তি একত্রিত করে ঘুসি পাকালাম একটা। বুঝতে পারছি, এই ঘুসির জোর স্তম্ভিত করে দিতে যাচ্ছে স্বয়ং আমাকেই। রামাদীনের ধড় থেকে নিশ্চয়ই এটা আলাদা করে দিতে পারবে মুণ্ডুটাকে। তা আমি করতে পারি না-কিন্তু কোথাও না কোথাও একটা

আঘাত আমাকে করতেই হবে। নিজেকে দমন করতে পারছি না। ওর ডান কানের পাশে বাঁকুটায় মারলাম ঘুসিটা। শক্ত কাঠের গায়ে গর্ত করে বাঁকুর ভেতর প্রায় কনুই পর্যন্ত ঢুকে গেল হাতটা। পপ সঙ্গীতের আসরে ভাবাবেগের উন্মাদনায় মেয়েরা যেমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে তেমনি একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল রামাদীনের গলার ভেতর থেকে। ছেড়ে দিলাম ওকে আমি, হলদেটে প্রস্রাবের মধ্যে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল সে।

আতঙ্কে তোতলাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, কাদছে-এই অবস্থায় ওকে ফেলে রেখে দরজা খুলে গলিতে, সেখান থেকে মেইন রোডে বেরিয়ে এলাম। সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গেছি আমি। কাপড়চোপড় পরে আছি, কিছু টাকাও আছে আমার কাছে, কিন্তু উলঙ্গ, রিক্ত আর নিঃশ্ব লাগছে নিজেকে আমার। নরকের একটা কীট ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে আমাকে, মিস্টার রানা থেকে এক ধাক্কায় নেমে এসেছি রানাতো।

বাস্তবকে মেনে নিতে কষ্ট হল। কিন্তু সময় নষ্ট করলাম না। লর্ড নেলসনে পৌঁছুবার আগেই রোজগারের অসংখ্য উপায় আবিষ্কার করে ফেললাম আমি। করতে চাইলে কাজের কোন অভাব হয় না মানুষের। পকেট কাটা, মাটি কাটা, ফল-পাকড় মাথায় নিয়ে ফেরি করা, শামুক কুড়ানো, মোট বওয়া, পাথর ভাঙা, দড়ি পাকানো-এই রকম হাজার হাজার কাজ গিজ গিজ করছে মাথার ভেতর।

মাত্র বিকেল হয়েছে, লর্ড নেলসনের পাবলিক বারে তাই রডরিক আর ল্যাম্পনি ছাড়া কেউ এসে পৌঁছায়নি এখনও। চুপচাপ শুনল ওরা, কোন মন্তব্য করল না। বলার আছেই বা কি!

প্রথম দফার মদটা নিঃশব্দে শেষ করলাম আমরা। তারপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম রডরিককে, কি করবে তুমি এখন?

কাঁধ ঝাঁকাল রডরিক।

পুরানো হোয়েলবোটটা এখনও তো আছে আমার...

অ্যাডমিরালটি ডিজাইনের হোয়েলবোটটা বিশ ফুট লম্বা, ডেকটা খোলা, কিন্তু সাগরকে বশে রাখতে তার কোন অসুবিধে। হয় না।

...আবার আমি সেই ক্রাইফিশ ধরে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে নিতে পারব। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কথা শেষ করল রডরিক। জলকুমারীকে নিয়ে দ্বীপে আমি আসার আগে এই কাজই করত সে।

নতুন ইঞ্জিন দরকার হবে তোমার, বললাম ওকে। পুরানো সী-গাল দুটো প্রায় অচল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দফা মদ এল, এই। ফাঁকে আমার পুঁজির হিসেব করছি মনে মনে-দুত্তোরি ছাই, ভাবলাম আমি, দুহাজার ডলারে কি আর উন্নতি অবনতি ঘটবে। আমার এই অবস্থায়। দুটো নতুন বিশ ঘোড়ার ইঞ্জিন কিনে দেব তোমাকে আমি, রডরিক, বললাম ওকে।

তা তোমাকে কিনতে দিচ্ছি না, প্রচণ্ড জোরে মাথা দোলাল রডরিক। মিসাস বেশ কিছু টাকা জমিয়েছে, এখন চাইলে দেবে।

কিছুক্ষণ তর্ক হল আমাদের মধ্যে। জমা টাকায় হাত দিতে নিষেধ করলাম ওকে। বিপদ-আপদের কথা কিছু বলা যায় না, তখন পাবে কোথায়? কিন্তু জেদ ধরে বসে থাকল রডরিক, আমার কাছ থেকে দান নিতে রাজি নয় সে।

তুমি কি করবে বলে ভাবছ, ল্যাম্পনি? জানতে চাইলাম আমি।

মনে হচ্ছে তিন বছরের চুক্তিতে রায়ানো দ্বীপেই কাজ করতে যেতে হবে আমাকে, স্লান মুখে বলল ল্যাম্পনি।

না, মুখ ভেঙে ধারণাটাকে বাতিল করে দিল রডরিক। হোয়েলবোটের জন্যে ক্রু দরকার হবে আমার।

ওদের দুজনেরই তাহলে একরকম ব্যবস্থা হল। স্বস্তি বোধ করলাম আমি। ওদের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে, সেটা আমি কখনও এড়িয়ে যাবার কথা ভাবতেও পারি না। বিশেষভাবে খুশি হলাম এই কথা ভেবে যে ল্যাম্পনির ওপর নজর রাখার জন্যে রডরিক রইল। জুডিথের মৃত্যুটাকে খুব খারাপ ভাবে নিয়েছে ছেলেটা। গুম মেরে গেছে ও, গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। আগের সেই আনন্দোচ্ছল ছটফটে রোমিও মেরে গেছে। উদ্ধারের কাজে কাঠোরভাবে খাটিয়েছি ওকে, আঘাতটা সামলে ওঠার ব্যাপারে সাহায্যে লেগেছে সেটা।

তবু হরদম মদ খেতে শুরু করেছে ও। এভাবে চলতে দিলে মারা যাবে ও কিছুদিনের মধ্যেই। যাক, রডরিক অন্তত ওকে বাধা দেবার জন্যে থাকছে।

কিন্তু পরিবেশটা আরও যেন ভারী হয়ে উঠল। ছোট্ট আলোচনাটার পর এখন আর তিনজনের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, এবং আগামীকাল থেকেই কখনও আর একসাথে হাঁটব না আমরা।

চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে রডরিকের, কিন্তু দুর্বলতাটা প্রকাশ করে পরিবেশটাকে আরও আড়ষ্ট করতে চাইছে। না সে। দুহাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দ্রুত চোখ ঘষছে। কি যে ছাই পড়ল চোখে!

সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত গুমোট ভাবটা রয়েই গেল। তারপর নেশায় ধরল আমাদেরকে। শুরু হল গান। ল্যাম্পনি মাতলামো করার মধ্যে অংশগ্রহণ করল না। নেশায় বুদ্ধ হয়ে চুপচাপ বসে। ঢুলছে সে। অবশ্য মাঝেমধ্যে হয় আমি নয়ত রডরিক তার মাথাটা টেবিল থেকে তুলে দিচ্ছি, এবং একবার তুলে দিলে আবার দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে নিশ্চিন্ত, সিধে হয়ে বসে নিয়মিত দোল খেতে শুরু করছে সে।

রাত নটার পর এক কাণ্ডই ঘটে গেল।

বন্দরে আজ সন্ধ্যায় একটা সাউথ আফ্রিকান ট্রলার এসেছে, খুচরো মেরামতের কাজ সারবে আর বিশুদ্ধ পানি নেবে। অবশেষে ল্যাম্পনি যখন চেতনা হারাল, নিজেদের মধ্যে একটা আপোস করে নিয়ে আমি আর রডরিক কেউ কারও আগে পরে নয়, একযোগে গান ধরলাম-কিন্তু একটু পরই ট্রলারের ছয়জন ক্রু এসে ঢুকল বারে, এবং আমরা নাকি গাধার মত চাঁচাচ্ছি বলে বিদ্রোপ করল।

এ ধরনের অপমান মুখ বুজে সহ্য করার সাধ্য আমার বা রডরিকের নেই। তাই আমরা সবাই ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করার জন্যে লর্ড নেলসনের পেছন দিকের উঠানে চলে এলাম। ঠিক হল, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা মীমাংসা করা হবে।

উঠানে পৌঁছবার দশ সেকেন্ড পরই ভঙ্গ হল শান্তি। এর জন্যে একা কারও ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই, আমি এবং রডরিক দুজনেই দায়ী, আমাদের দুজনের হাতই কিছু একটা করার জন্যে নিশপিশ করছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার মীমাংসা হল অত্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে। দাঙ্গাদমনকারী স্কোয়াড নিয়ে ইন্সপেক্টর টমসন হুইসেল বাজাতে বাজাতে হাজির। সে আমাদের সবাইকে তো গ্রেফতার করলই, কাছেপিঠে যাকে দেখতে পেল তারই কোমরে দড়ি পরাল।

আমার নিজের রক্তমাংস..., পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সেলের ভেতর আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছে রডরিক, আর বিলাপ করছে, ...আমার নিজের রক্তমাংস আমারই সাথে বেঁজমানী করল! নিজের আপন মামাকে তুই কয়েদ করলি! মাসুদ, দুনিয়ার চালচলন বদলে গেছে, বুঝলে? আপনজন আর আপন নেই। আমার নিজের বোনের ছেলে, সে আজ আমার কোমরে দড়ি দিল, কয়েদে আটক করল...।

বন্দীত্বের অভিশাপ খানিকটা সহনীয় করার জন্য যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিল ইন্সপেক্টর টমসন। আমরা বিদ্রোহ করব হুমকি দিতেই লর্ড নেলসনে একজন লোককে পাঠাল সে। এবং একটু পরই আমি আর রডরিক পাশের সেলের বন্দী ইলারম্যানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললাম। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ মদের বোতলটা এক সেল থেকে আরেক সেলে দ্রুত এবং ঘন ঘন আসা যাওয়া করতে শুরু করল।

পরদিন সকালে আমাদেরকে সম্ভবতঃ উৎকট আপদ জ্ঞান করেই মুক্তি দিয়ে বাঁচল ইন্সপেক্টর টমসন। আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতেও অস্বীকৃতি জানাল সে।

সরাসরি টার্টল বে থেকে ফিরে এসে বাড়িটাকে শেষবারের মত গুছাতে শুরু করলাম আমি। তৈজসপত্র ধুয়ে-মুছে তুলে রাখলাম সব। আলমিরা আর ওয়ারড্রোবে কয়েকটা করে ন্যাপথালিন গুলি রাখলাম যাতে পোকা মাকড় আস্তানা গাড়তে না পারে। দরজায় অবশ্য তালা মারলাম না। সেন্ট মেরীতে চৌর্যবৃত্তি নামে কোন পেশার অস্তিত্ব নেই।

শেষবারের মত সাঁতার কেটে রীফ ছাড়িয়ে চলে এলাম আমি। আধঘন্টা ধরে প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করলাম আমার সুহৃদদের জন্যে। কিন্তু আজও এল না ওরা। আবার কবে ফিরি কি না ফিরি, অথচ দেখা হল না-মনটা স্বভাবতই খারাপ হয়ে গেল। সাঁতার কেটে ফিরে এলাম বাড়িতে। শাওয়ার নিয়ে পোশাক পরলাম, তারপর ক্যানভাস আর লেদার ব্যাগ নিয়ে। বেরিয়ে এসে উঠে বসলাম পিকআপে। পাম গাছের ভেতর দিয়ে চলে আসছি, পেছন ফিরে পঁচিশ একর শান্তির নীড়ের দিকে একবারও তাকলাম না। তবে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই পথে আবার একদিন ফিরে আসব আমি।

হোটেল হিলটনের গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চুরুট ধরলাম একটা। শিফটিং ডিউটি শেষ করে দুপুরবেলা বেরিয়ে এল মারিয়া। ফুটপাথ ধরে হাঁটছে ও, মিনি স্কার্ট পরে রয়েছে, চমৎকার হাঁটার ছন্দে দুলছে ওর সুগঠিত নিতম্ব। শিস দিতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, এবং আমাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়ে উঠল। দৌড়ে এসে গাড়িতে আমার পাশের সিটে বসল। পরমুহূর্তে স্নান হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা।

মিস্টার রানা, তোমার বোটের জন্যে সত্যি আমি খুব দুঃখ। পেয়েছি...

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর আমি জানতে চাইলাম, আচ্ছা, মারিয়া, তুমি বলতে পারবে হোটেলে থাকার সময় মিস রাফেলা কোথাও কোন টেলিফোন বা টেলিগ্রাম করেছিল কিনা?

মনে করতে পারছি না, মিস্টার রানা, তবে আপনি বললে চেক করে দেখতে পারি আমি।

এখনই?

অবশ্যই।

আরেকটা কথা। মিকি মিস রাফেলার কোন ফটো তুলেছিল কিনা জানতে চাই আমি। হিলটনের স্টাফ-ফটোগ্রাফার মিকি, তার অ্যালবামে রাফেলার ফটো থাকার কথা।

প্রায় এক ঘন্টা দেরি করল মারিয়া, কিন্তু ফিরল বিজয়িনীর হাসি নিয়ে। হোটেল ত্যাগ করার আগের রাতে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তিনি, টেলিগ্রামের একটা কপি দিল আমাকে মারিয়া। এটা রেখে দিতে পারেন আপনি।

মেসেজটা পড়ছি আমি।

ঠিকানা দেয়া রয়েছে-সিডনি ফ্ল্যাট, ফাইভ কার্জন স্ট্রীট, নাইনটি সেভেন লগুন ডব্লিউ. আই.

মেসেজে বলা হয়েছে

কন্ট্রাক্ট সাইনড রিটার্নিং হিথরো বি-ও-এ-সি ফ্লাইট থ্রীহানড্রেড-সিক্সটিন।

স্যাটারডে।

কোন সই নেই।

সবগুলো ফাইল আর অ্যালবাম ঘাটতে হয়েছে মিকিকে-তবে একটা ফটো পেয়েছে ও। মারিয়ার হাত থেকে সিক্স-বাই-ফোর গ্লসি প্রিন্টটা নিলাম আমি। সানগ্লাস আর বিকিনি পরা অবস্থায় তোলা ফটোটো, সান কাউচে ডুবে আছে রাফেলা-তবে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না তাকে।

ধন্যবাদ, মারিয়া, পিন দিয়ে ওর ব্রেসিয়ারে একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট গেঁথে দিয়ে বললাম আমি।

ধনী লাগছে নিজেকে, মুক্তোর মত সাদা দাঁত বের করে হাসছে মারিয়া। পাঁচ পাউণ্ডের বিনিময়ে যা খুশি তাই দাবি করতে পারেন আপনি, মিস্টার রানা।

প্লেন ধরতে হবে আমাকে, মারিয়া, বললাম ওকে। ওর নাকে নাক ঘষলাম, তারপর গাড়ি থেকে যখন নেমে যাচ্ছে, ওর নিতম্বে চাপড় মারলাম একটা।

এয়ারপোর্টে আসার আগেই পৌঁছে গেছে রডরিক আর ল্যাম্পনি। আমার পিকআপের দায়িত্ব এখন থেকে রডরিক নেবে। আমাদের সবার মন খারাপ, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এবং নিঃশব্দে কর্মমর্দন করলাম ডিপারচার গেটের কাছে। বলার আর কার কি আছেই বা। গতরাতেই সব কথা বলা হয়ে গেছে আমাদের।

মেইনল্যান্ডের উদ্দেশ্যে আকাশে উঠল প্লেন। পেরিমিটার বেড়ার কাছে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি আমি।

লণ্ডনগামী বি. ও. এ. সি ফ্লাইট ধরার জন্যে নাইরোবিতে তিন ঘন্টার জন্যে থাকতে হল। একটা বারে বসে সময়টা কাটিয়ে দিলাম। রডরিক, ল্যাম্পনি-এদের কথা ভুলতে পারছি না। কিন্তু নিজেকে হতাশায় ডুবে যেতেও দিলাম না। ইংল্যান্ড আমার জন্যে নরকতুল্য, অথচ সেখানেই যাচ্ছি আমি। প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে, তা নাহলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব।

রাফেলা, অপেক্ষা করো। আসছি আমি। তোমার সাথে আমার কথা আছে।

.

কে যেন বলেছিলেন, যখন তোমার আর্থিক দুর্গতির সীমা নেই তখনই একটা নতুন গাড়ি কেনো, কেনো একশো গিনির স্যুট, চেহারায় সাহস আর সাফল্যের ভাব ফুটিয়ে তোল-দেখবে, লোকজন তোমাকে যথেষ্ট খাতির করছে, তোমাকে সাহায্য করতে চাইছে।

হিথরো এয়ারপোর্টে দাড়ি কামিয়ে পোশাক পাল্টালাম, তারপর হিলম্যান না নিয়ে রেন্ট-এ-কার কোম্পানির কাছ থেকে। একটা ক্রাইসলার ভাড়া করলাম। বুটে ব্যাগগুলো ফেলে দামি গাড়িটা হাঁকিয়ে সবচেয়ে কাছের একটা পাবে পৌঁছুলাম।

চিকেন স্যাণ্ডউইচ আর এগ পাই নিয়ে গলাধঃকরণ করলাম এক পাইন্ট কারেজ দিয়ে। এই ফাঁকে রোড ম্যাপটার সাথে এক দফা পরিচয় ঝালিয়ে নেয়া গেল। অনেক দিন পর আবার এসেছি লণ্ডনে, এককালে সব রাস্তাঘাট নখদর্পণে ছিল, দেখলাম ভুলে গেছি অনেক কিছুই।

ব্রাইটনে পৌঁছুতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। লগুনের রোদ স্নান সোনালি রঙ বিকিরণ করছে, সেন্ট মেরীর রোদের মত উত্তাপ। বা উজ্জ্বলতা এর নেই, কিন্তু উপভোগ্য। গ্র্যাণ্ড হোটেলের। উল্টোদিকে পার্কিং লটে ক্রাইসলার রেখে গলি উপগলির গোলকধাঁধায় প্রবেশ করলাম। বসন্তের শেষভাগেও এলাকাটায় ট্যুরিস্টদের ভিড় দেখতে পাচ্ছি।

নিরোর আগারওয়াটার স্লেজের গায়ে কতদিন আগে দেখেছি ঠিকানাটা, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে আজও। ফাইভ প্যাভিলিয়ন আর্কেড, ব্রাইটন, সাসেক্স। খুঁজে বের করতে এক ঘন্টার ওপর লেগে গেল।

নিরোস আগারওয়াটার ওয়ার্ল্ড গলির গায়ে দশ ফুট জায়গা দখল করে রেখেছে। দরজাটা বন্ধ। পাশে একটা মাত্র জানালা, তাও কাঠের খড়খড়ি দিয়ে ঢাকা। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। দরজায় ঘুসি মেরেও কোন লাভ হল না। বোঝা যাচ্ছে, কেউ নেই। ফিরে আসতে যাচ্ছি কি মনে করে আরেকবার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকালাম। ভাগ্যগুণে জানালার ঠিক নিচেই মেঝেতে একটা কার্ডবোর্ড পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। জানালার গায়ে আটকানো ছিল এক সময়, সম্ভবত বাতাসে পড়ে গেছে। তবে লেখার দিকটা ওপর দিকে রয়েছে, তাই গোটা গোটা অক্ষরে হাতে লেখা মেসেজটা স্বল্প আলোয় পড়তে অসুবিধে হল না।

সী-ভিউ, ডোনাস লেন, ফালমার, সাসেক্স-এ খোঁজ করুন।

গাড়িতে ফিরে এসে গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে রোড ম্যাপটা আবার বের করলাম আমি।

.

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এর মধ্যে বৃষ্টি নামল। গলির ভেতর দুবার পথ হারিয়ে ফেললাম আমি। অবশেষে লতাঝোপ দিয়ে ঘেরা একটা গেটের সামনে দাঁড় করালাম গাড়ি। গেটের গায়ে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা সী-ভিউ।

গেট পেরিয়ে বাগানের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এগোচ্ছি। লাল ইটের দোতলা একটা বাড়ি সামনে। নিচের তলার একটা কামরায় আলো জ্বলছে।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি রেখে নামলাম আমি। সামনের দরজাটাকে উপেক্ষা করে উঠনে নামলাম। শার্টের কলার সিঁধে করে ঘাড়টা ঢেকে ছুটলাম কিচেনের দরজা লক্ষ্য করে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই ভিজে গেলাম আমি। দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ পেলাম। হুড়কো সরাবার

আওয়াজ হল। দরজার ওপরের অংশটা উন্মুক্ত হয়ে গেল চোখের সামনে। একটা মেয়ে-তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

দেখে তেমন কিছু মনে হল না মেয়েটাকে আমার। সৌখিন ফিশারম্যানের ঢোলা জার্সি পরে আছে ও। বেশ লম্বা, এবং কাঁধ দুটো সাঁতারুর। চেহারাটা শুধু সাদামাঠা নয়, বড় বেশি সাধারণ।

কপাল চওড়া ওর, রঙটা নিশ্চয়। নাকটা বড়, কিন্তু ছুঁচালো। বা হাড়সর্বস্ব নয়। নাকের নিচে ঠোঁট দুটো মিষ্টি। মেকআপের কোন চিহ্ন নেই সেখানে। ঠোঁটের রঙ হালকা গোলাপী, ক্ষীণ একটু বেগুনি রঙের ভাবও যেন আছে।

কপাল এবং গাল থেকে খুঁটিয়ে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চুলগুলোকে পেছন দিকে, লাল সিল্কের একটা ফিতেতে গিঁট বেঁধে আটকানো হয়েছে সেগুলো ঘাড়ের পেছনে। চুলগুলোর রঙ কালো, ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে। স্লান গায়ের রঙের সাথে মিশে আছে তাজা এবং সজীব একটা লাবণ্যের প্রলেপ, কাছ থেকে বেশ কিছুক্ষণ দেখলে তবেই অদ্ভুত একটা আলোময় উজ্জ্বলতা ধরা পড়বে চোখে। হঠাৎ সেই গভীর আলোটা দেখতে পেলাম আমি, মনে হল ওর চামড়ার নিচে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, পরিষ্কার রক্তের উষ্ণ প্রবাহ উঠে আসছে গলা এবং গালের দুদিকে। ফিতের গিঁটকে ফাঁকি দিয়ে কালো সিল্কের সুতোর মত কয়েক গাছি চুল কপালে এসে পড়েছে, আলতোভাবে সেগুলো আঙুল দিয়ে ছুলো ও। ভঙ্গিটার মধ্যে অদ্ভুত একটা মাধুর্য ফুটে উঠল। দুধ-সাদা জমিনের ওপর কালো রঙের চোখের মণি দুটো শান্ত-সেদিকে তাকিয়ে ওর নার্ভাসনেস টের পাবার কোন উপায় নেই।

তারপর ল্যাম্পের আলো লেগে ঝিক করে উঠল চোখের মণি দুটো, সর্বিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম ও-দুটো কালো নয়, দুপুরের কড়ারোদ সরাসরি মোজাস্টিক স্রোতে পড়লে তার রঙ যেমন গাঢ় নীল হয়ে ওঠে, চোখের মণি দুটো ঠিক সেই রকম। চোখের ওপর কালো ধনুকের মত বাঁকা এবং স্পষ্ট ভুরু।

আচমকা উপলব্ধি করলাম অসাধারণ সুন্দরী একটা মেয়ে নয়, পূর্ণ যুবতী এক নারীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। হঠাৎ যেন নতুন চেতনা ফিরে পেয়েছি, বুঝতে পারছি, ওকে অতি সাধারণ মনে করে কি সাংঘাতিক ঠকাই না ঠকতে যাচ্ছিলাম আমি। অদ্ভুত একটা সমর্থ আর পরিণত ভাব রয়েছে ওর মধ্যে, ঠায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে গভীর প্রশান্তি সুপ্ত হয়ে রয়েছে-অনুভব করতে পেরে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম আমি।

দেখামাত্র সবটুকু চিনতে পারি এমন মেয়েদের সান্নিধ্য পেতে অভ্যস্ত আমি। যারা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের অধিকারিণী তাদের কাছে ঘেঁষার সৌভাগ্য এর আগে কখনও হয়নি আমার।

পরিবশেটা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে বুঝতে পেরে নিজের সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত
হলাম আমি।

পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছি আমরা। কেউ কথা বলছি না, বা নড়ছি না।

তুমি মাসুদ রানা, অবশেষে নিস্কলতা ভাঙল ও। ওর কণ্ঠস্বর মৃদু, কোমল, সুরেলা। বিদূষী নারীর
পরিশীলিত কণ্ঠস্বর।

চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল আমার। আমাকে তুমি চিনলে কিভাবে? জানতে চাইলাম আমি।

ভেতরে এসো, চেইন খুলে দরজার নিচের অংশটা উন্মুক্ত করল ও।

মনে একরাশ প্রশ্ন, কিন্তু নিঃশব্দে পালন করলাম ওর নির্দেশ।

কিচেনের ভেতরটা গরম, ভাল খাবারের সুগন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

পাঁচ

তুমি আমার নাম জানলে কিভাবে? প্রশ্ন করলাম।

খবরের কাগজে তোমার ছবি বেরিয়েছিল-নিরোর সাথে, মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

আবার চুপ করে গেলাম আমরা। পরস্পরকে লক্ষ করছি।

প্রথমে যতটুকু মনে হয়েছিল তার চেয়েও বেশি লম্বা ও, আমার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছেছে। গাঢ়-নীল রঙের প্যান্ট পরে আছে ও, পায়ে কালো চামড়ার বুট। এখন ওর সরু কোমর, এবং মোটা জার্সির নিচে সুডৌল, সুউন্নত বুকুর আভাস পাচ্ছি।

প্রথমে সাদামাঠা মনে হবার দশ সেকেন্ড পর ভেবেছিলাম অসাধারণ সুন্দরী ও, কিন্তু এখন আমার স্থির বিশ্বাস দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের মধ্যে ও একজন। অনুভূতি এবং উপলব্ধির এই বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়াটা পুরো হজম করতে সময় লাগছে আমার।

একটা অসুবিধের মধ্যে ফেলে রেখেছ তুমি আমাকে, একসময় বললাম ওকে। আমি তোমার নাম জানি না।

আমি রাফেলা বার্ড, উত্তরে বলল ও।

ধাক্কাটা ভালভাবেই খেলাম। পনেরো সেকেন্ড বোকামি মত তাকিয়ে থাকলাম নিঃশব্দে। আরেকজন রাফেলা বার্ডকে চিনি আমি, তার সাথে এর কোন মিলই নেই।

এই নামের গোটা একটা দল আছে, তা কি তুমি জানো? জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

মৃদু ভুরু কুঁচকে তাকাল ও আমার দিকে। বুঝিয়ে বলবে? কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হয়নি, কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠেছে পুরোমাত্রায়।

বড় গল্প। বলতে প্রচুর সময় লাগবে।

দুঃখিত, হঠাৎ খেয়াল হয়েছে ওর, কিচেনের মাঝখানে অনেকক্ষণ ধরে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছি আমরা, এবং আমাকে বসতে বলেনি। বসবে না তুমি? একটা বিয়ার দেব?

কাবার্ড থেকে এক জোড়া বিয়ারের ক্যান তুলে নিল ও, আমার উল্টো দিকে কিচেন টেবিলের ওধারে বসল।

তাই? বড় গল্প? ক্যান দুটো খুলল ও, হাত বাড়িয়ে একটা রাখল আমার সামনে। তারপর মুখ তুলল, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

নিরো সেন্ট মেরীতে পা দেবার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে তার একটা সম্পাদিত বিবরণ ওকে দিতে শুরু করলাম আমি। খুব সহজে কথা বলা যায় ওর সাথে, যেন একজন উৎসাহী এবং অতি পরিচিত আপনজন শুনছে আমার কথাগুলো। এবং হঠাৎ হল কি, ওকে সমস্ত সত্য বলে ফেলার অদ্ভুত একটা তাড়না অনুভব করলাম নিজের ভেতর। বারবার মনে হচ্ছে, একেবারে শুরুতেই কোন রকম রাখটাক না করে সততার সাথে সব জানানো দরকার ওকে। মনে হচ্ছে, ওর কাছে সত্য প্রকাশ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্পূর্ণ অপরিচিতা ও, অথচ যতটা নিজেকে বিশ্বাস করি ততটাই বিশ্বাস করলাম ওকে। যা কিছু ঘটেছে সব নির্দিধায় জানালাম।

রাত আর একটু বাড়তে আমাকে ও খাওয়াল। ওর চেহারা সংক্রান্ত ব্যাপারটার সাথে পরিবেশিত খাবারের অদ্ভুত একটা মিল দেখতে পাচ্ছি। বাড়িতে হাতে তৈরি রুটি, ফার্মের মাখন, সুপ, মাটন চপ ইত্যাদি খাবারগুলো অতি সাধারণ, কিন্তু স্বাদে গন্ধে প্রতিটি অতুলনীয়। এখনও আমি বকবক করে যাচ্ছি, কিন্তু এখন আর সেন্ট মেরীর সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলছি না। নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে ও। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে আজ যেন আমি একজনকে পেয়েছি যাকে অবাধে মন খুলে বলা যায় নিজের সব কথা।

আমি যে একজন স্পাই, একথাটা ছাড়া নিজের আর সব কথাই ফাঁস করে দিলাম বিনা দ্বিধায়। এমন কি জলকুমারী কেনার টাকা কোথেকে পেয়েছিলাম সে-কথাও বলতে বাধল না আমার।

মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর অবশেষে মুখ খুলল ও। বলল, নিজের সম্পর্কে এত খারাপ কথা, তা যদি সত্যি হয়ও, কেউ বলে কি? যাই হোক, তোমার সব কথা বিশ্বাস করতে পারছি, এমন নয়। তোমাকে ওরকম মনে হয় না-মনে হয়..., শব্দ নির্বাচন করার জন্যে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল ও, ...তুমি একজন ভাল মানুষ। ভাল শব্দটা উচ্চারণ করল বটে, কিন্তু ঠিক এই শব্দটাই বলতে চেয়েছে কিনা সন্দেহ হল আমার।

ভাল মানুষ বলতে ঠিক যা বোঝায় আমি তা নই, সরল স্বীকারোক্তি দিলাম আমি। তবে তা হবার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছি আমি, আজও করছি। তুমি হয়ত বুঝবে, আসলে ভাল একজন মানুষ হওয়ার চেষ্টার মত কঠিন কাজ নেই আর। জানো, অনেক সময় ভাল-মন্দের বিচার করার সময় ইচ্ছে করে অন্ধ সাজি আমি। তখন আমি আর ভাল মানুষ থাকি না। আমাকে দেখে তোমার মনে হয়... হঠাৎ হাসলাম আমি, আসলে চেহারা সব সময় সত্যি কথা বলে না।

হ্যাঁ, তা ঠিক, ওর বলার ভঙ্গিতে আশ্চর্য্য একটা তাৎপর্য ফুটে। উঠল। যেন প্রচ্ছন্নভাবে সতর্ক করে দিল ও আমাকে। তারপর বলল, কিন্তু এতসব কথা আমাকে কেন শোনাতে তুমি? কাজটা খুব বুদ্ধিমানের মত হল না, যাই বল।

ঠিক তোমাকে শোনাতে চেয়েছি, ব্যাপারটা তা নয়। এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমার সব কথা তোমার মত কাউকে জানাবার জন্যে ছটফট করছিলাম ভেতর ভেতর। তুমি নির্বাচিত হওয়ায় আমি দুঃখিত।

হাসল ও। বলল, আজ রাতটা নিরোর কামরায় কাটাতে পার তুমি। বাইরে বেরিয়ে আর কাউকে এসব বলবে, সে ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।

গত রাতে ঘুমাইনি আমি, হঠাৎ ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করলাম। কিন্তু আরও একটা কথা বলা বাকি আছে আমার। সেন্ট মেরীতে কেন গিয়েছিল নিরো? জিজ্ঞেস করলাম ওকে। কি খুঁজছিল ও? তুমি জানো, কাদের সাথে কাজ করছিল ও, কি তাদের পরিচয়?

আমি জানি না, মৃদু মাথা নেড়ে বলল ও। বুঝলাম, সত্যি কথা বলছে। ওকে আমি এতটা বিশ্বাস করছি, এরপর আমাকে মিথ্যে কথা বলতে পারে না।

আমি জানতে চাই, ওকে জানালাম। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

হ্যাঁ, করব, কথাটা বলে উঠে দাড়াল ও। নিরো কেন গিয়েছিল, কাদের সাথে গিয়েছিল এসব আমিও জানতে চাই। কাল সকালে আবার আমরা কথা বলব, ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

নিরোর কামরাটা দোতলায়। ফটোগ্রাফ আর বুক শেলফ দখল করে রেখেছে সবগুলো দেয়াল। একটা ছোট শো-কেসে রয়েছে রূপোর অনেকগুলো ট্রিফি। ছাত্রজীবনে খেলাধুলোয় ভাল ছিল সে।

ক্রাইসলার থেকে আমার ব্যাগগুলো নিয়ে এলাম আমি, ইতিমধ্যে উঁচু আর নরম বিছানায় নতুন চাঁদর বিছিয়ে দিয়েছে রাফেলা। বাথরুমটা কোনদিকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল ও।

বৃষ্টির রিমঝিম শুনছি, এরমধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। তারপর কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পাচ্ছি নিস্তব্ধ বাড়ির কোথাও যেন ফিসফিস করে কথা বলছে কে। একটু পরই বুঝলাম অস্ফুট কণ্ঠস্বরটা রাফেলার।

আগারপ্যান্ট পরা অবস্থায় এবং খালি পায়ে বেডরুমের দরজাটা নিঃশব্দে খুললাম। পা টিপে টিপে প্যাসেজের শেষ মাথায় সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। নিচে হলের মাঝখানে একটা ল্যাম্প জ্বলতে দেখছি, এবং দেয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাফেলা। রিসিভারের মাউথপীসটা দুহাত দিয়ে আড়াল করে ধরে অস্ফুট স্বরে কথা বলছে ও, শব্দগুলো বুঝতে পারছি না। আলোটা ওর পেছনে, স্বচ্ছ ফ্রন্টটা তাই ভাল দেখা যাচ্ছে না, নগ্ন দেখাচ্ছে ওকে।

পিপিংটমের মত তাকিয়ে আছি ওর দিকে। ওর শরীরের চামড়ায় চকচক করছে ল্যাম্পের আলো। ট্রান্সপারেন্ট কাপড়ের ভেতর রহস্যময় খাঁদ, বাক আর ছায়া দেখে উত্তেজনা বোধ করছি।

চোখ ফিরিয়ে নিতে কষ্ট হল একটু। আবার পা টিপে ফিরে এলাম বেডরুমে। ভাবছি, এত রাতে কাকে টেলিফোন করছে ও?

অশান্তি লাগছে। কিন্তু ঘুম এসে মুক্তি দিল আমাকে।

.

ভোরের দিকে থেমেছে বৃষ্টি। তাজা বাতাসের লোভে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি রাস্তাঘাট কাদায় থকথক করছে, খানাখন্দ ভরাট হয়ে গেছে পানিতে।

ব্রেকফাস্টের সময় রাতের চেয়ে আরও সহজ লাগছে রাফেলাকে। হালকা কথা এবং মৃদু হাসির মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা।

একসময় বলল, কথা দিয়েছি সাহায্য করব। কিন্তু কি করতে পারি আমি, বলো?

কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো।

যদি জানা থাকে। জিজ্ঞেস করো।

কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করছিল নিরো, সে যে সেন্ট মেরী দ্বীপে যাচ্ছে তা নিজের চেয়ে এক বছরের বড় বোনকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। রাফেলা প্রশ্ন করতে তাকে। জানিয়েছিল, পর্তুগীজ মোজাম্বিকে কাবোরা-বাসা ড্যামে এক প্রশ্ন ইলেক্ট্রনিক আগুারওয়াটার ইকুইপমেন্ট বসাবার একটা কন্ট্রাক্ট পেয়েছে সে। সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হয় নিরো, রাফেলা তাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়। যতদূর জানা আছে ওর, নিরো একাই যাচ্ছিল। ব্রাইটনের কারখানায় এসে পুলিশ খবর দিয়ে যায় নিরো খুন হয়েছে। খবরের কাগজে ছাপা রিপোর্টও পড়েছে ও। এর বেশি কিছুই জানা নেই ওর।

নিরোর কোন চিঠি পাওনি তুমি?

একটা চিঠি বা একটা খবর-কিছু পাইনি।

বুঝলাম নেকড়ে-জোড়া নিরোর চিঠিপত্র মাঝপথে কোথাও থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা রেখেছিল। নকল রাফেলা যে চিঠিটা দেখিয়েছিল আমাকে সেটা নিরোরই লেখা ছিল।

গোটা বিষয়টা কেমন যেন ধোঁয়াটে, কিছুই বুঝছি না ভাল করে। কোথাও কি বোকামি করছি আমি?

না, একটা চুরুট বের করে প্রায় ধরিয়ে ফেলেছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হতে তাকালাম ওর দিকে। চুরুট ধরালে অসুবিধে হবে তোমার?

না, মৃদু কণ্ঠে বলল ও। চুরুট ফাঁকা ছেড়ে দিতে হবে না ভেবে মনটা সাংঘাতিক খুশি হয়ে উঠল।

যতদূর বোঝা যাচ্ছে, বড় কিছু একটা আবিষ্কারের আশায় সেন্ট মেরী দ্বীপে গিয়েছিল নিরো, বললাম ওকে। উদ্ধার করার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার হয় ওর, তাই পার্টনার জোগাড় করে, কিন্তু তার এই পার্টনাররা লোক ভাল ছিল না। কোথেকে জিনিসটা উদ্ধার করতে হবে তা জানতে পেরেছে মনে করা মাত্র তারা আমাকে এবং নিরোকে খুন করতে চেষ্টা করে। আমি বেঁচে যাই, কিন্তু নিরো মারা যায়। তারপর মারা যায় তারা দুজনও। কিন্তু তাদের বড়কর্তারা রয়ে গেছে। সেই কর্তারা যখন দেখল প্রতিনিধিরা ব্যর্থ হয়েছে এবং লগুনে তাদের আর কোনদিন ফিরে আসার সম্ভাবনাও নেই তখন তারা একটা মেয়েকে তোমার পরিচয় দিয়ে পাঠাল সেন্ট মেরীতে। জিনিসটা কোথায় আছে তা জানতে পেরেছে মনে করে এই মেয়েটিও একটা ফাঁদ পেতে। আমাকে খুন করার আয়োজন সম্পন্ন করল, এবং ফিরে এল এখানে। ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে, বুঝতে পারছ?

বিগ গাল আইল্যান্ডে লোক পাঠাবে এবার ওরা।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবং এবারও সম্পূর্ণ নিরাশ হতে হবে ওদেরকে।

আমাদের কফির কাপ দুটো আরেকবার ভরে দিল রাফেলা। লক্ষ করছি, আজ সকালে মেকআপ ব্যবহার করেছে ও, কিন্তু তা এতই সামান্য যে ওর স্বচ্ছ গভীর লাভণ্য তাতে ঢাকা না পড়ে আরও যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ওর সৌন্দর্য সম্পর্কে এখন আবার একবার সিদ্ধান্ত বদল করলাম আমি। পৃথিবীতে ওর মত সুন্দরী মেয়ে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। তাও ভোরের জ্ঞান আলায় দেখছি ওকে।

কফির কাপের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে ও। ফর্সা, সুগঠিত ওর হাত দুটো টেবিল ক্লাথের ওপর আমার হাতের পাশে পড়ে রয়েছে। সেগুলো আমার ধরতে ইচ্ছে করছে।

উদ্ধার করতে চাইছে ওরা-কি সেটা, রানা? এবং কারা ওরা?

চমৎকার দুটো প্রশ্ন। এগুলোর উত্তর পাবার কিছু কিছু সূত্র জানা আছে আমার। প্রথম প্রশ্ন, কি জিনিস উদ্ধার করতে চেয়েছিল নিরো? এর উত্তর জানার পর তার খুনীদের পরিচয় জানতে চেষ্টা করব আমরা।

এ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আমার, মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রাখল ও। কি সূত্র পেয়েছ তুমি?

জাহাজের বেল। বেলের গায়ে নকশা এবং খোদাই করা অক্ষর।

কি অর্থ ওগুলোর?

এখনও জানি না, কিন্তু চেষ্টা করলে জানতে পারব। ঝাঁকটা সামলাতে না পেরে ওর হাতে হাত রাখলাম আমি। হাতটা গরম, এবং একটা দৃঢ়তা অনুভব করছি। সবচেয়ে আগে এখানে নিরোর কামরা আর ব্রাইটনে ওর দোকান ঘরটা চেক করতে চাই আমি। কোন না কোন সূত্র পাবই আমরা।

হাতটা সরিয়ে নেয়নি ও। বলল, বেশ। প্রথমে কি আমরা দোকানে যাব? ইতিমধ্যে পুলিশ একবার তল্লাশি চালিয়ে গেছে। তবে ওদের চোখে হয়ত ধরা পড়েনি সূত্রগুলো, আদৌ যদি কিছু থাকে ওখানে।

নিশ্চয়ই আছে, আশা প্রকাশ করলাম আমি। চলো, বেরিয়ে পড়ি। আমি তোমাকে লাঞ্ছ খাওয়াব। মৃদু চাপ দিলাম ওর হাতে। হাতটা আমার মুঠোর ভেতর ঘুরিয়ে সিধে করে নিল ও, তারপর পাল্টা চাপ দিল একটু।

লাঞ্চ-বেশ, ওটা তোমাকে নিয়ে যাবার পারিশ্রমিক, হাসল ও।

কিন্তু আমার হাতে ওর হাতের সাড়া পেয়ে এমন বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছি যে কথা বলতে পারছি না। গলা শুকিয়ে গেছে। হার্টবিট সাংঘাতিক বেড়ে গেছে, যেন এইমাত্র এক মাইল দৌড়ে এসেছি। ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও।

এসো, ব্রেকফাস্টের ডিশগুলো ধুয়ে ফেলি।

সেন্ট মেরীর মেয়েরা এখন যদি দেখে মিস্টার রানা থালাবাসন ধুচ্ছে সাথে সাথে পাংচার হয়ে যাবে আমার সব প্রেক্ষিজ।

পেছনের দরজা দিয়ে দোকানে নিয়ে গেল আমাকে রাফেলা। উঠনটা ছোট, ডাইভিং সরঞ্জাম আর পানির নিচ থেকে পাওয়া নানা ধরনের জিনিসের সমাবেশ এখানে। অনেকগুলো বাতিল এয়ার বটল, একটা পোর্টেবল কমপ্রেশার, তামার পোর্টহোল ছাড়াও রয়েছে বিশ্বস্ত জাহাজ থেকে উদ্ধার করা জিনিস, এমন কি সবগুলো দাঁতসহ একটা কিলার হোয়েলের চোয়াল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।

অনেক দিন আসা হয়নি এদিকে, দোকানের পেছনের দরজা খোলার সময় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল রাফেলা। নিরোই যখন নেই... কাঁধ ঝাঁকাল ও, এসব বিক্রি করে দিয়ে দোকানটা উঠিয়ে দেবার কথা ভাবতে গেলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে। অন্তত লীজটা রি-সেল করা যেতে পারে।

শুরু করি আমি, ঠিক আছে?

ঠিক আছে। আমি বরং স্টোভে বসিয়ে দিই কেটলিটা।

উঠন থেকে শুরু করলাম। লোহা-লক্কড়ের স্টুপ নাড়াচাড়া করে তাৎপর্যপূর্ণ কিছুই পড়ল না চোখে। এরপর দোকানে ঢুকে সী-শেল আর হাঙ্গরের দাঁতের ভিড়ে হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। শো-কেসেও পেলাম না কিছু। ডেস্কের ড্রয়ারগুলো পরীক্ষা করছি, এই সময় কফি নিয়ে ভেতরে ঢুকল রাফেলা। ডেস্কের ধারে আমার কাপটা রেখে তিমির একটা চোয়ালের ওপর বসল ও।

ইনভয়েস, চিঠি, ফাইল-কিছু বাদ না দিয়ে ধৈর্যের সাথে সব পড়ছি এক এক করে। অবশেষে নিরাশ হয়ে মুখ তুললাম।

কিছুই পেলে না? জানতে চাইল ও।

কিছুই পেলাম না, রিস্টওয়াচ দেখলাম আমি। চলো, লাঞ্চার সময় হয়েছে।

দোকান বন্ধ করে একটা ইংলিশ রেস্টোরাঁয় এলাম আমরা। এক বোতল দামি ভুইস্কির সাথে লবস্টারের অর্ডার দিলাম আমি। দাম শুনে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হল, কিন্তু ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর খেতে বসে বাকি সময়টা প্রচুর হাসলাম আমরা, এবং এর পেছনে সবটাই মদের কৃতিত্ব নয়। পরস্পরকে আমরা আরও ভালভাবে জানছি এবং আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছি। প্রথম প্রেমে পড়ছে মাসুদ রানা।

লাঞ্চার পর সী-ভিউয়ে ফিরে এলাম আমরা। কোন রকম আলস্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে সোজা নিরোর কামরায় ঢুকে পড়লাম আমি। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ, কিছু পাওয়ার সম্ভাবনাও সবচেয়ে বেশি এখানে। গোপন কিছু যদি আদৌ থাকে, নিজের শোবার কামরাতেই তা রাখার কথা নিরোর। কিন্তু বুঝতে পারছি, সামনে আমার লম্বা কাজ পড়ে রয়েছে। কয়েকশো বই আর পত্রিকা দেখতে পাচ্ছি কামরার ভেতর। বেশির ভাগই আমেরিকান আরগোসি, ট্রাইডেন্ট, দ্য ডাইভার এবং অন্যান্য ডাইভিং প্রকাশনা। বিছানার পায়ের কাছে ফাইল ঠাসা একটা শেলফও দেখতে পাচ্ছি।

কাজ করো, তোমাকে আর বিরক্ত করব না, বলে চলে গেল রাফেলা।

একটা শেলফের যাবতীয় বইপত্র রিডিং টেবিলে নিয়ে এসে কাজে বসলাম। সাথে সাথে টের পেলাম যা ভেবেছি তার চেয়ে শত গুণ কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ কাজ এটা। হাতে পেন্সিল নিয়ে পড়তে বসে যারা, নিরো ছিল তাদেরই দলের একজন। প্রতিটি বই এবং পত্রিকার মার্জিনে নোট লিখেছে সে, লাইনের নিচে দাগ টেনেছে, পাশে মন্তব্য লিখেছে, বিস্ময় এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঝাঁকিয়েছে। কাজের বোঝা দেখে ভয় পেলাম, কিন্তু পিছু হটলাম না। অসীম ধৈর্যের সাথে পড়ে যাচ্ছি সব, সেন্ট মেরীর সাথে কোথাও সম্পর্ক আছে কিনা খুঁজছি।

রাত আটটায় এক কাপ কফি দিয়ে গেল রাফেলা। আমার করুণ দশা দেখে ভয় পেল সম্ভবত, কোন কথা না বলে চলে গেল নিঃশব্দে। বিছানার পায়ের দিকের শেলফটা থেকে ফাইল নামিয়ে নতুন উদ্যমে কাজে হাত দিয়েছি আমি আবার। প্রথম ফাইলটায় রয়েছে জাহাজ এবং সমুদ্র বিষয়ে পেপারকাটিং। দ্বিতীয় ফাইলটা চামড়া দিয়ে মোড়া, কিন্তু কোন লেবেল সাঁটা নেই গায়ে। দেখেই বুঝলাম, এটা সাধারণ একটা ফাইল নয়, ভেতরে এনভেলোপে সাঁটা রয়েছে এখনও। প্রত্যেকটির গায়ে একই ঠিকানা-মেসার্স। পার্কার অ্যান্ড উইলটন, ফেনচার্ট স্ট্রীট। প্রত্যেকটা চিঠি আলাদা। হস্তাক্ষর বহন করছে, সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে পাঠানো হয়েছে এগুলো-কানাডা, সাউথ আফ্রিকা, ভারতএবং উনিশ শতকের পোস্টেজ স্ট্যাম্পগুলো সম্ভবত ভাল দামে বিক্রি হবে এখন।

দুটো চিঠি পড়ার পর বুঝলাম মেসার্স পার্কার অ্যাণ্ড উইলটন একটা এজেন্সি, কুইন ভিক্টোরিয়ার অধীনস্থ কর্মচারীরা এদের মঞ্চেল। চিঠিগুলোয় সম্পত্তি, টাকা, কার্গো এবং বিভিন্ন বিষয়ের নিরাপত্তা বিধান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চিঠিগুলো লেখা হয়েছে আঠারোশো সাতান্ন সালের আগস্ট থেকে আঠারোশো আটান্ন সালের জুলাইয়ের মধ্যে। যাই হোক, দশ নাম্বার চিঠিটা পড়তে শুরু করে এমন কিছু চোখে পড়ল আমার, বুকের ভেতর ছলকে উঠল রক্ত।

চিঠির একজায়গায় দুটো শব্দের নিচে লাল কালির দাগ টানা হয়েছে, এবং চিঠির মার্জিনে একটা নোট রয়েছে। নোটটা নিরোর। লেখা, চিনতে পারছি। দুর্বোধ্য লাগছে-B. Mus. E 6914 (8).

তবে শব্দ দুটোই আমাকে নাড়া দিয়েছে। ইংরেজি শব্দ ডন লাইট, বাংলা করলে দাঁড়ায়-ভোরের আলো।

ডন লাইট-শব্দ দুটোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আর ভাবছি এর আগে কোথায় যেন শুনেছি এগুলো। কখন, কোথায়, কার মুখে-কিছুই এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না-তবে শুনেছি।

ভারতের বোম্বে শহর থেকে পাঠানো হয়েছে চিঠিটা। তারিখ দেয়া হয়েছে-১৬ সেপ্টেম্বর, আঠারোশো সাতান্ন। সাল। প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলাম চিঠিটা।

প্রিয় উইলটন
অনারেবল কোম্পানির জাহাজ ভোরের আলো এ মাসের পঁচিশ তারিখে এখানকার বন্দর ত্যাগ করছে এবং যথাসময়ে পোর্ট অভ লগুনে কোম্পানির নিজস্ব জেটিতে নোঙর ফেলবে। ভোরের আলোতে পঁচটা লাগেজ রয়েছে আমার, তোমার নামে এবং তোমার লগুনের ঠিকানায় পাঠাচ্ছি। অত্যন্ত গুরুত্ব এবং যত্নের সাথে এই লাগেজের দায়িত্ব নেবে তুমি এবং তোমার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নিরাপদ গুদামে রাখার ব্যবস্থা করবে। লাগেজগুলো সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ ঠিকমত বুঝে পেলো কিনা তা পাবার সাথে সাথে জানাবে আমাকে।

তোমার		বিশ্বস্ত		বন্ধু,
কর্নেল	স্যার		রজার	গুডচাইল্ড।
অফিসার	কম্যান্ডিং	একশো	একতম	রেজিমেন্ট
কুইনস ওউন ইণ্ডিয়া রাইফেলস।				

এই চিঠি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছেন হার ম্যাজেস্টির ফ্রিগেট
প্যানথারের ক্যাপ্টেন।

কাগজ ধরা আমার হাতটা উত্তেজনায় কাঁপছে। কিভাবে যেন বুঝতে পেরে গেছি আসল সূত্রটা পেয়ে
গেছি আমি। এটাই সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি। অত্যন্ত সাবধানে এবং যত্নের সাথে রিডিং টেবিলে
রাখলাম চিঠিটা, রূপোর একটা পেপার নাইফ চাপা দিলাম সেটার ওপর। তারপর ধীরে ধীরে, গভীর
মনোযোগ দিয়ে আবার পড়তে শুরু করলাম লেখাটা। কিন্তু চট করে মনোযোগ কেড়ে নিল একটা
বিপ্লব। গলি থেকে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসছে। গেট পেরিয়ে উঠানে ঢোকান সময়
জানালায় গায়ে হেডলাইটের এক ঝলক আলো দেখা গেল। বাক নিয়ে বাড়ির এক প্রান্তে থামল সেটা।

শিরদাড়া খাড়া হয়ে গেছে আমার। শুনছি। থেমে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। ঘটাং করে বন্ধ হল গাড়ির
দরজা।

তারপর কিছুক্ষণ আর কোন শব্দ নেই।

একটু পর একটা চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তার সাথে বেশ ভারী একটা ধমকানির সুর। পুরুষ
কণ্ঠ। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছি আমি।

অকস্মাৎ চাঁচিয়ে উঠল রাফেলা। নিস্তব্ধ বাড়িতে ওর চিৎকারটা পরিষ্কার এবং ভৌতিক লাগল কানে,
বুকের ভেতর গরম ছুরি ঢোকানোর মত একটা অনুভূতি হল আমার। প্রতিরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি এমন
প্রচণ্ডভাবে জেগে উঠল আমার ভেতর যে সিঁড়ি ভেঙে হলে নামার পর প্রথম খেয়াল করলাম হাঁটতে
শুরু করেছি আমি।

কিচেনের দরজাটা খোলা, ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। দুজন লোক রাফেলার
সাথে। বয়স্ক লোকটার পরনে উটের পশম দিয়ে তৈরি একটা টপকোট এবং মাথায় সুতির একটা
ক্যাপ। লোকটার চোখ দুটো কোর্টরের ভেতরে সঁধিয়ে আছে, মুখে চর্বির ভাঁজ।

রাফেলার বাঁ হাত মুচড়ে দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখান পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে লোকটা, গ্যাস স্টোভের
পাশে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে রেখেছে ওকে।

অপর লোকটা অল্পবয়স্ক রোগা, মাথাটা খালি, খড়ের মত হলদেটে চুল দুই কাঁধ প্রায় ঢেকে রেখেছে।
পরনে একটা লেদার। জ্যাকেট। অদ্ভুত স্থির একটা হাসি দেখাতে পাচ্ছি তার ঠোঁটে। রাফেলার ডান
হাতটা শক্ত করে ধরে আছে সে। গ্যাস রিঙের আগুনের দিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে।

মরিয়া হয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে রাফেলা। কিন্তু দুজনের সাথে পারছে না ও। ধস্তাধস্তিতে চুল খুলে গেল ওর, কাঁধের ওপর দিয়ে নেমে এল নাভির নিচ পর্যন্ত।

ধীরে, বৎস, মাথায় ক্যাপ পরা লোকটা ভারী, চাপা গলায় বলল, একটু সময় দাও ওকে, চিন্তা করে দেখুক!

নীল আগুনের শিখাগুলো হিস হিস করছে। ছোকরার মুখের স্থির হাসিটা একটুও বদলাল না, হঠাৎ চাপ দিয়ে রাফেলার হাতটা নামিয়ে ফেলল সে, আগুনের ওপর কিলবিল করছিল আঙুলগুলো, আঁচ লাগতেই গুটিয়ে একটা মুঠো পাকিয়ে গেল-আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল রাফেলার গলা থেকে।

চঁচাও, যত পার চঁচাও, মাথার হলুদ চুল নেড়ে ফিসফিস করে বলছে ছোকরা। তোমার চিৎকার শোনার জন্যে কেউ নেই আশপাশে।

আমি? চৌকাঠ পেরিয়ে বললাম। ঝট করে দুজনেই ফিরল ওরা আমার দিকে, চোখমুখে বিস্ময় এবং কৌতুকের ভাব।

কে... রাফেলার হাত ছেড়ে দিয়েই ব্যাক পকেটে হাত ঢোকাতে শুরু করেছে ছোকরাটা।

দুটো ঘুসি মারলাম ওকে, বাঁ দিকের পাঁজরে আর মাথার ডান দিকে। কিন্তু ছোকরার শরীরে মাংস না থাকায় ঘুসি দুটো ঠিক জমল না, বিশেষ তৃপ্তি লাভ করা থেকে বঞ্চিত হলাম আমি, তবে এতেই পড়ে গেল সে। প্রথমে একটা চেয়ারের ওপর তারপর সেটাকে নিয়ে মেঝেতে।

টপকোটের দিকে ফিরলাম দ্রুত।

নিজের সামনে এখনও রাফেলাকে ধরে রেখেছে সে, দুহাতের প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল ওকে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছে রাফেলাও, এই সময় ওকে ধরে ফেলে দুজনেরই পতন কোনরকমে ঠেকালাম।

ঘুরল লোকটা, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে।

রাফেলাকে ছেড়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল আমার। দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম উঠানে, ইতিমধ্যে ট্রায়াম্প স্পোর্টস কারের দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে টপকোট। সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত হঠাৎ এক সেকেন্ড থেমে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন দিকে তাকাল সে।

পরিষ্কার বুকে নিলাম, হিসাব কষে নিল লোকটা। গাড়ির কাছে পৌঁছে সেটাকে গেটের দিকে ঘুরিয়ে নেবার সময় নেই ওর, তার আগেই পৌঁছে যাব আমি। বাঁ দিকে ঘুরে গেল সে, গেট পেরিয়ে গলির অন্ধকার মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গলিতে বেরিয়ে এসে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না অন্ধকারে। থকথকে কাদা আর খানাখন্দে জমে ওঠা পানির ওপর দিয়ে ছুটছি, নিজের পায়ের দ্রুত শব্দ ছাড়া আর কিছু কানেও ঢুকছে না। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম ওকে সামনে। পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে সামলে নিল শেষ মুহূর্তে। কিন্তু বুঝতে পেরেছে, ওর ঠিক পেছনে চলে এসেছি আমি।

অপ্রত্যাশিতভাবে আধপাক ঘুরে দাঁড়াল সে। খট করে থাপ থেকে ছুরির ফলা বেরিয়ে আসার শব্দ পেলাম। ঘাড়টা নিচু করে ফেলল দ্রুত, ডান হাতে ধরা ছুরিটা শরীরের পাশে চলে গেছে। ছুটে যাচ্ছি আমি এখন। শুধু ছুরিটা সামনে বাড়িয়ে দিলেই হয় ওর। কিন্তু তার দরকার হবে বলে মনে করেনি ও, বুঝতে পারলাম আমি না থামায় ওকে চমকে উঠে মৃদু ঝাঁকি খেতে দেখে।

এটা ওর অভিজ্ঞতার বাইরে। ধারাল ইম্পাতের ঝিলিক দেখে বেশির ভাগ লোক নিশ্চল পাথর হয়ে যায়। ছুরি ধরা হাতটা বিদ্যুৎ গতিতে সামনে বাড়িয়ে দিল সে, কিন্তু তবু এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেরি করে ফেলেছে।

শরীরটার চেয়ে আগে পৌঁছল আমার হাত ওর গায়ে। একহাতে ওর কজ্জি ধরে ফেলে, একই সাথে ওর বগলের নিচে ঘুসি মারলাম। ছুরিটা পড়ে গেল ওর হাত থেকে, তারপরই আমার কোমরের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল ও। বৃষ্টিতে নরম কাদা হয়ে গেছে মাটি, তার ওপর পিঠ দিয়ে দড়াম করে পড়ল ভারী শরীরটা। একটা ভাঁজ করা হাঁটু ওর পেটে রেখে শরীরের ভার চাপিয়ে দিলাম। হুশ করে সশব্দে ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে এল ওর। জরায়ুর দুণের মত কুঁকড়ে গেল ও, বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছে। মাথার ক্যাপটা সরিয়ে মুঠো করে ধরলাম। চুলগুলো, তারপর হলুদ কাদায় ডুবিয়ে দিতে শুরু করলাম মুখটা।

মেয়েদের গায়ে কেউ হাত তুললে আমার মাথার ঠিক থাকে না, আলাপের সুরে বললাম ওকে। ঠিক তখনই আমার পেছনে জ্যান্ত হয়ে উঠল ট্রায়াম্পের ইঞ্জিন।

গেটের উল্টোদিকের দেয়ালে পড়ল হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো। দ্রুত বেরিয়ে এল গাড়িটা, বাঁক নেবার সময় নাকটা ঘষা খেল দেয়ালের সাথে। টপকোটকে ছেড়ে দিয়ে চোখের সামনে হাত তুললাম আমি। ছুটলাম গাড়িটার দিকে। কিন্তু ইতিমধ্যে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সোজা হয়ে গেছে ট্রায়াম্প, সোজা এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

ডাইভ দিয়ে পড়লাম কাদার ওপর, গড়িয়ে খোলা ড্রেনের কিনারা থেকে ঝপ করে নিচে নামলাম। ট্রায়াম্পের একটা চাকা কাদা-পানি ছিটিয়ে সোজা আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। দেখে গলির লেভেল থেকে দ্রুত নামিয়ে নিলাম সেটা, প্রায় একই সময়ে ড্রেনের অপর দিকের ইটের দেয়ালে গুঁতো মারল গাড়ির নাক। চাকাটা আমার মাথার ওপর বন বন করে ঘুরছে। গাড়ির তোবড়ানো নাক দেয়ালের সাথে ঘষা খেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, দ্রুত সোজা করে নিল হলুদ চুল গাড়িটাকে। মাথা তুলে দেখলাম টপকোটের পাশে ঘাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রায়াম্প, দরজাটা খুলে গেছে আগেই। কাদা থেকে মুখ তুলে উঠে বসছে টপকোট।

ড্রেন থেকে উঠে দৌড়তে শুরু করেছি, এরই মধ্যে আবার গতি সঞ্চার হল ট্রায়াম্পে। পেছনের চাকা থেকে কাদা-পানি ছিটকে এসে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিল আমার। খানিক দূর ধাওয়া করে নিরাশ হলাম আমি। মাটি ছেড়ে ইট-বিছানো রাস্তায় উঠে গেছে ট্রায়াম্প, গতি বেড়ে গেছে তার। দৌড়ে বাড়ির দিকে ফেরার সময় ক্রাইসলারের চাবির জন্যে ভিজে পকেট হাতড়াচ্ছি। মনে পড়ল, নিরোর কামরায় টেবিলের ওপর রেখে এসেছি সেটা।

খোলা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাফেলা। পোড়া হাতটা বুকের কাছে তুলে অপর হাত দিয়ে ধরে রেখেছে, মুখের দুপাশে এবং কাঁধে কালো চুল আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বাতাসে। কাঁধের কাছ থেকে কনুই পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে ওর জার্সি।

চেষ্টা করেছি, রানা, এখনও হাঁপাচ্ছে ও। কিন্তু আটকাতে পারলাম না ওকে।

কতটা পুড়েছে? রাফেলার অবস্থা দেখে গাড়ি নিয়ে ট্রায়াম্পকে ধাওয়া করার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলাম।

জ্বালা করছে।

ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে...

দ্রুত মাথা দোলাল ও। না, হাসল জোর করে। অতটা সিরিয়াস কিছু নয়। কিন্তু ব্যথায় ঠোঁট বেঁকে গেল ওর।

নিরোর কামরায় গিয়ে আমার মেডিসিন কিট থেকে দুটো পেইন কিলার আর একটা ঘুমের ট্যাবলেট এনে দিলাম ওকে। কিন্তু আপত্তি জানাল ও, বলল, এমন কিছু হয়নি যে ওষুধ খেতে হবে।

নাক চেপে ধরে আঙুল দিয়ে ঠেলে দেব গলার ভেতর, তাই চাও? প্রশ্নটা শুনে প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়ল ও, হেসে ফেলল, তারপর গিলে নিল ট্যাবলেটগুলো।

গোসল করবে না? বলল ও।

হঠাৎ খেয়াল হল, কাদা মেখে ভূত সেজে আছি আমি, এবং ঠাণ্ডায় কাঁপছি। গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে কিচেনে ঢুকে দেখি ঘুমের ট্যাবলেট এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে, চোখের পাতা নেতিয়ে পড়তে চাইছে রাফেলার। তবে দুজনের জন্যে কফি তৈরি করেছে ও। পরস্পরের সামনে বসে খেলাম সেটা আমরা।

কি চাইছিল ওরা? জানতে চাইলাম। ঠিক কি বলছিল তোমাকে?

ওদের ধারণা নিরো সেন্ট মেরী দ্বীপে কেন গিয়েছিল তা আমি জানি। সেটাই জানতে চাইছিল।

ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলাম। কোথায় যেন একটা গরমিল রয়েছে, অথচটা পরিষ্কার নয়। উদ্বিগ্ন হলাম।

মনে হয়... জড়িয়ে গেল রাফেলার কথা, এবং হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে উঠল ও। এই! কি খাইয়েছ তুমি আমাকে?

টেবিল ঘুরে এগিয়ে গেলাম আমি। ধরে ফেললাম ওকে। হাঁটু আর গলার পেছনে হাত রেখে শূন্যে তুলে নেবার সময় দুর্বল ভাবে প্রতিবাদ করল ও। বুকে তুলে ওর কামরায় নিয়ে গেলাম ওকে। কামরাটায় মেয়েলি রুচির ছাপ লক্ষ্য করলাম। দেয়ালগুলো গোলাপ ফুল ছাপা কাগজ দিয়ে ঢাকা। বিছানায় শুইয়ে খুলে দিলাম পায়ের জুতো জোড়া। তারপর চাঁদর টেনে ঢেকে দিলাম পা থেকে গলা পর্যন্ত।

একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজল ও। হাতের কাছে রাখা দরকার তোমাকে, ফিসফিস করে বলল ও, খুব কাজের লোক তুমি।

প্রশংসায় উৎসাহিত হয়ে বিছানার কিনারায় বসলাম আমি, মাথায় হাত বুলিয়ে চুলগুলো পরিপাটি করলাম, তারপর কপালে মৃদু চাপড় মেরে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি ওকে। ওর কপালের চামড়া উষ্ণ ভেলভেটের মত লাগছে হাতে। এক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। আলো নিবিয়ে দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টালাম।

নিজের পায়ের জুতো খুলে ফেলে বিছানায় উঠে পড়লাম। তারপর ঢুকে পড়লাম চাদরের নিচে। ঘুমের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাশ ফিরল ও, আমার দুই হাতের মাঝখানে চলে এল। ঘনিষ্ঠ ভাবে ধরে থাকলাম ওকে।

অদ্ভুত একটা তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমিও। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল আমার। গলার সাথে সঁটে আছে রাফেলার মুখ, একটা পা আর একটা হাত তুলে দিয়েছে ও আমার ওপর। ওর চুলগুলো নরম লাগছে মুখে, সুডসুড়ি দিচ্ছে।

ওকে না জাগিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম, চুমো খেললাম ওর কপালে। পায়ে জুতো গলিয়ে নিঃশব্দে ফিরে এলাম নিরোর কামরায়। এই প্রথম পুরো একটা রাত সুন্দরী এক মেয়ের সাথে এক বিছানায় কাটলাম আমি, যে-রাতে ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করিনি। আশ্চর্য এক নির্মলতা অনুভব করলাম, মনে হচ্ছে বাতাস ভরা বেলুনের মত ফুলে উঠেছি আমি, হালকা হয়ে গেছি।

ছয়

নিরোর কামরায় ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম সেভাবেই পেলাম চিঠিটা। বাথরুমে যাবার আগে আরেকবার পড়লাম সেটা। কাগজটার মার্জিনে পেন্সিলের দাগটানা নোটটা বিমূঢ় করে তুলেছে আমাকে। B. Mus. E 6914 (8)-কি অর্থ এটার, দাড়ি কামাতে বসে ভাবছি।

বৃষ্টি থেমে গেছে, প্রায় পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ। নিচে। নেমে কিচেনে ঢুকে দেখি ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে রাফেলা।

হাতের কি অবস্থা?

জ্বালা-পোড়া শুরু হয়েছে আবার, স্বীকার করল ও।

লগুনে যাবার পথে একজন ডাক্তারকে দেখাতে হবে।

কে বলল তোমাকে লগুন যাচ্ছি আমি? টোস্টে মাখন লাগাচ্ছে রাফেলা, খুব সাবধানে প্রস্তুত করল ও।

কেউ বলেনি, দুটো কারণে বুঝতে পারছি যেতে হবে তোমাকে।

যেমন?

এখানে তোমার থাকা উচিত নয়, নেকডের দল আবার ফিরে আসবে, দ্রুত মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে, কিন্তু কিছু বলল না। আরেকটা কারণ, আমাকে তুমি সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছ-এখন সূত্র অনুসরণ করতে হলে লগুনে যেতে হয়।

কি সূত্র পেয়েছ তুমি?

ব্রেকফাস্টে বসে নিরোর ফাইল থেকে পাওয়া চিঠিটা দেখালাম ওকে।

যোগসূত্রটা কোথায় তা তো বুঝছি না, মোটেও উৎসাহ দেখাল না ও।

আমার কাছেও ঠিক পরিষ্কার নয় ব্যাপারটা, খোলাখুলি স্বীকার করলাম। চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লাম একমুখ, প্রতিক্রিয়া হল জাদুমন্ত্রের মত। কিন্তু ভোরের আলো শব্দ দুটো দেখামাত্র চমকে উঠেছি

আমি... হঠাৎ চুপ করে গেলাম। মাই গড! রুদ্ধশ্বাসে প্রায় চাঁচিয়ে উঠলাম তারপর। ইউরেকা! পেয়েছি।
ভোরের আলো!

মানে?

কিছু একটা বলল রাফেলা, কিন্তু কি বলল সেদিকে মনোযোগ নেই আমার এই মুহূর্তে। জলকুমারীর
ব্রিজে ভেন্টিলেটরের নিচে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে শুনছিলাম নিরো আর ব্ল্যাক্‌সের কথাবার্তা।

ভোরের আলো পেতে হলে... নিরোর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, পরিষ্কার বাজছে এখনও কানে।

ব্যস্ততার সাথে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছি ব্যাপারটা, হঠাৎ হেসে উঠল রাফেলা। আমার উত্তেজনার
ছোঁয়া ওকেও লেগেছে, কিন্তু তাড়াহুড়োর সাথে কি বলছি তার কিছুই বুঝতে পারছে না ও। এই,
প্রতিবাদের সুরে বলল ও, ভেবেচিন্তে, ধীরেসুস্থে বুঝিয়ে বলা।

আবার শুরু করলাম নতুন করে, কিন্তু অর্ধেকটা ব্যাখ্যা করে চুপ করে গেলাম, নিঃশব্দে তাকিয়ে আছি
ওর দিকে।

আবার কি হল? কিছুটা কৌতুক, কিছুটা হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে জানতে চাইল ও। আমাকেও তুমি
পাগল করে ছাড়বে দেখছি।

কুটি কাটার ছুরিটা ছোঁ মেরে তুলে নিলাম টেবিল থেকে। ঘন্টাটার কথা মনে আছে তোমার? যেটার
কথা বলেছিলাম তোমাকে? গানফায়ার রীফ থেকে যেটা তুলেছিল নিরো?

হ্যাঁ, মনে আছে। ঢং ঢং করে বাজছে নাকি ওটা, শুনতে পাচ্ছ?

হাসছি না ওর রসিকতায়। বললাম, তোমাকে বলেছিলাম বেলটার গায়ে খোদাই করা কিছু অক্ষর
আছে, তার বেশির ভাগই খেয়ে ফেলেছে বালি।

ভুরু কুঁচকে উঠল রাফেলার। এতক্ষণে গুরুত্ব দিচ্ছে আমার কথায়। হ্যাঁ। বলে যাও।

মাখনের বড় টুকরোর গায়ে ছুরি দিয়ে লিখলাম-VVN L-ঠিক ব্রোঞ্জের গায়ে যেভাবে খোদাই করা
দেখেছি অক্ষর চারটে।

আধ-খাওয়া অক্ষরগুলো ঠিক এই রকম দেখতে, বললাম ওকে। তখন এর কোন অর্থ বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন... দ্রুত বাকি অক্ষরগুলো জায়গা মত বসিয়ে শব্দ দুটো পূরণ করলাম, ফলে শব্দ দুটো দাঁড়াল এই রকম-DAWN LIGHT. মানে, ভোরের আলো।

বিস্মিত দৃষ্টিতে শব্দ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে রাফেলা। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে, মিলটা দেখতে পেয়েছে।

এই ভোরের আলো নামের জাহাজটা সম্পর্কে জানতে হবে আমাদেরকে।

কিভাবে তা জানা সম্ভব?

সহজেই। এরইমধ্যে জেনেছি আমরা ভোরের আলো একটা ভারতীয় মালবাহী জাহাজ-ঈস্ট ইণ্ডিয়াম্যান-নিশ্চয়ই এর রেকর্ড কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। দ্য বোর্ড অভ ট্রেড, লয়েডস। রেজিস্টার-খোঁজ নিলেই জানা যাবে।

আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আরেকবার পড়ল ও। সৌখিন কর্নেল গুডচাইল্ড সম্ভবতঃ নাংরা মোজা আর পুরানো শার্ট পাঠিয়েছিল জাহাজে করে। তাচ্ছিল্যের সাথে ঠোঁট বাঁকাল ও, চিঠিটা ফিরিয়ে দিল আমাকে।

সুখবর, বললাম ওকে। পায়ে দেয়ার জন্যে কিছু মোজা দরকার আমার।

.

ভাড়াটে কৃষক লোকটাকে বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে আমার সাথে রওনা হয়ে গেল রাফেলা। হালকা একটা স্যুটকেসে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ক্রাইসলারে ওঠার সময় বলল, মজার ব্যাপার কি জানো, কেন যেন মনে হচ্ছে দীর্ঘ একটা যাত্রার সূচনা হল আজ আমার।

চোখ মটকে বললাম, তোমাকে নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা আছে বটে।

দেখে তোমাকে যাই মনে হোক, হতাশ ভঙ্গিতে বলল ও, আসলে লোক তুমি ভাল নও।

পথে গাড়ি দাঁড় করলাম একটা ডাক্তারখানার সামনে। হাতের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে রাফেলার। সাদা মোটা পানি ভর্তি থলির মত ফোস্কা পড়েছে আঙুলের উল্টো পিঠে। থলিগুলো খালি করে আবার ব্যাগুজ বেঁধে দিল ডাক্তার।

জ্বালা-যন্ত্রণা বেড়ে গেল আরও, অভিযোগের সুরে একবার বলল রাফেলা। উত্তর দিকে ছুটছে আমাদের গাড়ি। বুঝতে পারছি, ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে ও। কিন্তু কোন শব্দ করছে না আর। ওর এই মৌনতাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম আমি।

শহরে ঢুকে ছোট্ট একটা তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল রাফেলা তার এক নিঃসঙ্গ কাকার বাড়িতে উঠবে। আমি উঠব কাছাকাছি একটা পাবে। একটা টেলিফোন বুদ থেকে ওর কাকাকে ফোন করল ও, গাড়িতে ফিরে এসে বলল, কাকা বাড়িতেই আছেন, আমি এসেছি শুনে খুব খুশি হয়েছেন।

নদীর কাছে নির্জন একটা রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি। রাফেলার স্যুটকেসটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি। কলিং বেলের বোতামে চাপ দিচ্ছে ও।

এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন, তাঁকে দেখেই কেন যেন সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করলাম আমি। ছোটখাট, হালকা গড়নের মানুষটা, বয়স প্রায় ষাট ছুঁই ছুঁই করছে, খয়েরি রঙের একটা কার্ডিগান পরে আছেন, পায়ে কার্পেট স্লিপার। কিন্তু ঘরোয়া পরিবেশ এবং পোশাকের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান লাগছে তাঁর জং ধরা লোহার মত লালচে মাথার চুল এবং ছোট্ট গোঁফদুটোরই অস্বাভাবিক যত্ন নেয়া হয়েছে। গায়ের রঙ পরিষ্কার। কিন্তু চোখের স্থির শ্যেনদৃষ্টি এবং উঁচু কাঁধ সাবধান করে দিল আমাকে। প্রকট নয়, কিন্তু ভদ্রলোক যে আশ্চর্য সচেতন হয়ে আছেন তা ধরা পড়ল আমার চোখে।

আমার কাকা, রিচার্ড বার্ড, পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে একপাশে সরে দাঁড়াল রাফেলা, আঙ্কেল, ইনি মাসুদ রানা।

ঝট করে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। হুঁ-এর কথাই বলছিলে তুমি? আঙ্কেল বার্ডের হাতটা শক্ত আর শুকনো, চোখের দৃষ্টি সুচের মত বিঁধছে আমার মুখে। এসো। দুজনেই ভেতরে এসো।

আপনাকে আর বিরক্ত করব না, স্যার..., সেনাবাহিনীতে ছিলাম, তাই কাকে স্যার সম্বোধন করতে হয় তা ভালই জানা আছে আমার। তাছাড়া, নিজের জন্যে একটা ঘাটি খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।

রাফেলা এবং আঙ্কেল বার্ড দৃষ্টি বিনিময় করল, এবং প্রায় ধরা যায় না এমনভাবে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে কোন ব্যাপারে যেন আঙ্কেলকে নিষেধ করল রাফেলা। ওদেরকে ছাড়িয়ে চলে গেছে আমার দৃষ্টি। ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্রগুলো সস্তাদরের, মোটেও আরামদায়ক নয়, এবং সাজাবার ভঙ্গিতে পুরুষালী ছাপ স্পষ্ট। আঙ্কেল বার্ড সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণাটাই দৃঢ় হল আরও। এর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে, পরিষ্কার জানিয়ে রাখলাম নিজেকে।

লাঞ্চের জন্যে এক ঘন্টা পর তুলে নেব তোমাকে, রাফেলা, বললাম আমি। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্রাইসলারে এসে উঠলাম।

রাস্তার শেষ মাথায় উইগুসোর আর্মস পাব, রাফেলার কথা মত আঙ্কেল বার্ডের নাম করতেই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ম্যানেজার পেছন দিকের একটা সুন্দর কামরা দিল আমাকে। কাপড়চোপড় ছেড়েই বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি, জানালা দিয়ে আকাশ আর টেলিভিশনের এরিয়াল দেখছি, বার্ড পরিবার এবং তাদের আত্মীয়ের কথা ভাবছি।

একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, এই দুই নাম্বার রাফেলাকে কোনভাবে গায়েব হয়ে যেতে দিচ্ছি না আমি। কিন্তু ওর অনেক ব্যাপার এখনও পরিষ্কার বুঝছি না-মনটা খুঁতখুঁত করছে। পবিত্র এবং সরল চেহারার ভেতর সম্ভবত জটিল একটা চরিত্র ও, থই পাচ্ছি না আমি। তবে, তল্লাশি চালিয়ে জানতে পারলে সেটা ইন্টারেস্টিং কিছু একটা হবে বলেই মনে হচ্ছে।

চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে উঠে বসলাম। লয়েডস রেজিস্টার অভ শিপিং, ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়ম এবং সবশেষে ইণ্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরিতে তিনটে ফোন করলাম। তারপর হেঁটে ফিরে এলাম আঙ্কেল বার্ডের বাড়িতে। লগুনে গাড়ি ব্যবহারে সুবিধের চেয়ে অসুবিধে বেশি।

পোশাক পাল্টে আমার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল রাফেলা, কলিং বেল টিপতেই বেরিয়ে এল ও।

আঙ্কেলকে পছন্দ হয়নি তোমার। ঠিক ধরেছি কিনা? লাঞ্চ টেবিলের ওদিক থেকে চ্যালেঞ্জ করল আমাকে ও।

সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলাম চ্যালেঞ্জটা, বললাম, ফোন করে জেনেছি ওয়াটারলুর কাছে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সন্ধান নিতে হবে আমাদেরকে। লাঞ্চ শেষ করে ওখানে যাব আমরা।

মেলামেশা করলে বুঝবে আঙ্কেল আসলে খুব ভাল লোক।

দেখ, প্রিয় বান্ধবী, উনি তোমার আঙ্কেল, তোমারই থাকুন-আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করো না।

কিন্তু কেন, রানা? ওকে ভয় পাচ্ছ কেন তুমি? কৌতূহল লাগছে আমার।

পেশাটা কি ওঁর? স্থল, নাকি নৌ-বাহিনীতে আছেন?

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রাফেলা আমার মুখের দিকে। তারপর বলল, তুমি জানলে কিভাবে?

হাজার লোকের ভিড় থেকেও ওদেরকে চিনতে পারি আমি।

আর্মিতে ছিলেন, রিটায়ার করেছেন-কিন্তু তাতে কি?

কোনটা পছন্দ তোমার? আবার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি আমি, মেনুটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম ওকে, তুমি রোস্টেড বীফ নিলে আমি ডাক নেব।

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল ও, প্রসঙ্গটা তুলল না আর।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পৌঁছে খাতায় সই করে ভিজিটরস কার্ড সংগ্রহ করলাম আমরা। তারপর ক্যাটালগরুম হয়ে মেরিন। সেকশনে ঢুকলাম। আমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল পক্কেশী বৃদ্ধা লাইব্রেরিয়ান, তাকে আমি অনারেবল কোম্পানির জাহাজ ভোরের আলো খুঁজে বের করে দেবার অনুরোধ জানালাম। বৃদ্ধা আমাদেরকে হতচকিত করে দিয়ে মই বেয়ে উঠে গেল একেবারে সেই সিলিংয়ের কাছে। সার সার ইম্পাতের শেলফ, সেগুলো দেখতে দেখতে বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল সে। নেমে এল মোটাসোটা একটা ফাইল বগলদাবা। করে আধঘন্টা পর। কার্ড-বোর্ডের একটা ফোল্ডার দিল আমাকে, বলল, এখানে সই করতে হবে। মজার ব্যাপার কি জানো, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে দুবার চাওয়া হল ফাইলটা।

সবচেয়ে নিচের সইটার দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলাম আমি। এখানে নিরো তার পুরো নাম লিখেছে জেমস নিরো বার্ড। ওর সইয়ের নিচে রয় পিয়ারসন লেখার সময় ভাবলাম নিরোকে নির্ভুলভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছি আমরা।

নির্জন এক কোণে চলে এলাম আমরা। পাশাপাশি বসলাম টেবিলে। একটা চুরুট ধরিয়ে খুললাম ফাইলটা।

ব্ল্যাকওয়াল ফ্রিগেট নামে পরিচিত টাইপের একটা জাহাজ ছিল ভোরের আলো, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্ডার মোতাবেক সাগরল্যাণ্ড-এর ব্ল্যাকওয়াল ইয়ার্ডে তৈরি; বহন ক্ষমতা এক হাজার তিনশো ত্রিশ নেট রেজিস্টার টন। পানির ওপর দৈর্ঘ্য ছিল দুইশো ছাব্বিশ ফুট, বীম ছাব্বিশ ফুট। বীম এত সরু যার, তার গতি খুব দ্রুত হওয়ার কথা, কিন্তু বাতাসের ধাক্কা বা বড় ঢেউয়ের আঘাতে বেসামাল হওয়ার সম্ভাবনাও তেমনি বেশি।

আঠারোশো বত্রিশ সালে প্রথমবার পানিতে নামার পর থেকে বারবার বিপদের মধ্যে পড়তে হয় ভোরের আলোকে।

বিভিন্ন ধরনের কোর্ট অভ এনকয়েরীর রিপোর্ট রয়েছে ফাইলটায়। ভোরের আলোর প্রথম ক্যাপ্টেনের নাম হগ। হুগলী নদীতে ডায়মণ্ড হারবারের ব্যাল্কে আছাড় খাওয়ায় সে ভোরের আলোকে। কোর্ট অভ এনকয়েরী তাকে বরখাস্ত করে, কারণ দুর্ঘটনার সময় মদ খেয়ে মাতাল সে।

এরপর আঠারোশো চল্লিশ সালে আবার দুর্ঘটনা ঘটে। সাউথ আটলান্টিক পাড়ি দেবার সময় ডগ ওয়াচে ছিল একজন সিনিয়র মেট, তার গাফিলতির জন্যেই ভোরের আলোতে চড়াও হবার সুযোগ পায় উন্মত্ত সাগর। এই হামলায় জাহাজের সমস্ত মাস্তুল ভেঙে পড়ে। অসহায়ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল, এই সময় তাকে আবিষ্কার করে একটা ডাচ জাহাজ। টেনে নিয়ে আসা হয় টেবল বে-তে। স্যালভেজ কোর্ট বারো হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করে।

আঠারোশো ছেচল্লিশ সালে আরেক দুর্বিপাকের শিকার হয়। ভোরের আলো। ঝঞ্ঝা বিস্মুদ্র নিউগিনি উপকূলে নোঙর ফেলেছিল সে, তার অর্ধেক ক্রু ছিল তীরে, সেখানে তারা একদল নরখাঁদক আদিম উপজাতিদের কবলে পড়ে। তেষট্টিজন ক্রুর সবাই তাদের ভোজ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

তারপর আঠারোশো সাতান্ন সালের তেইশে সেপ্টেম্বরে বোম্বে থেকে সেন্ট মেরী, দ্য কেপ অভ গুড হোপ, সেন্ট হেলেনা এবং দ্য পুল অভ লগুনের উদ্দেশে রওনা হয় সে।

তারিখের নিচে আঙুল রাখলাম আমি। এই ভয়েজের কথাই তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে কর্নেল গুডচাইল্ড।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল আমাকে রাফেলা।

কিন্তু সেন্ট মেরীতে পৌঁছায়নি ভোরের আলো-মাঝপথে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায় সে। তিনমাস পর ধরে নেয়া হয় সাগরে হারিয়ে গেছে চিরতরে।

জাহাজটা ছোট হলে কি হবে, প্রচুর কার্গো বহন করছিল সে। মেনিফেস্টে তার একটা হিসেবও রয়েছে।

তিনশো	চৌষট্টি	কেস	চা
চারশো	চুরানব্বই	হাফ-কেস	চাà
		মোট	বাহাত্তর
			টন

মেসার্স দানবার অ্যাও গ্রীনের কার্গো।

একশো এক কেস চাঃ মোট পঁয়ষড়ি টন।

ছয়শো আঠারো কেস চাঃ মেসার্স সিম্পসন, এলি অ্যাও লিভিংস্টনের কার্গো।

পাঁচশো সাতাত্তর বেল সিল্কঃ মোট বিরাশি টন
মেসার্স এলডার অ্যাও কোম্পানির কার্গো।

পাঁচ কেস পণ্যঃ মোট চার টন
কর্নেল স্যার রজার গুডচাইল্ডের কার্গো।

ষোলো কেস পণ্যঃ মোট ছয় টন।
মেজর জন কটনের কার্গো।

দশ কেস পণ্যঃ মোট দুই টন
লর্ড এলটনের কার্গো।

ছাব্বিশ বাক্স বিভিন্ন মশলাঃ মোট দুই টন।
মেসার্স পলসন অ্যান্ড কোম্পানির কার্গো।

নিঃশব্দে মেনিফেস্টের চার নাব্বার আইটেমের ওপর আঙুল রাখলাম আমি, আবার মাথা ঝাঁকিয়ে
সায় দিল রাফেলা।

ভোরের আলো অদৃশ্য হয়ে যাবার চারমাস পর অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন একটা মোড় নিল ঘটনা।
আঠারোশো আটান্ন সালের এপ্রিল মাসে জৈষ্ঠ ইণ্ডিয়াম্যান ওয়ালমার ক্যাসেল ভোরের আলোর বেঁচে
যাওয়া কয়েকজন ক্রু এবং যাত্রীকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছুল।

সংখ্যায় ছয়জন ছিল ওরা। ফাস্ট মেট এনডু বারলো, একজন স্টোরম্যানের মেট, এবং তিনজন পদস্থ
নাবিক। এক মেজরের মেয়ে, একুশ বছরের যুবতী মিস শার্লোট কটন প্যাসেঞ্জার হিসেবে দেশে
ফিরছিল, বেঁচে যাওয়া দলের সাথে এ-ও ছিল।

কোর্ট অভ এনকয়েরির সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাক্ষ্য দেয় ফাস্ট মেট বারলো। নীরস ব্যাখ্যা, একঘোয়ে প্রশ্ন এবং সতর্ক উত্তরের ভেতর নিহিত রয়েছে সাগরের উত্তেজনাপূর্ণ এক আশ্চর্য রোমান্টিক গল্প, বাঁচার আকুতি এবং জাহাজ ডুবির মহাকাব্য।

বোম্বে ত্যাগ করার চোদ্দ দিন পর দক্ষিণ-পূব দিক থেকে ধাবিত প্রলয়ঙ্করী একটা ঝড়ের মুখে পড়ে ভোরের আলো। উন্মত্ত ঝড়টা ভোরের আলোকে দাঁতে কামড়ে নিয়ে একনাগাড়ে সাতদিন ছুটে চলে। প্রায় সমস্ত মাস্তুল ভেঙে যায় তার। এবং অবশেষে যখন সামনে তীরভূমির দেখা পাওয়া যায় তখন জাহাজটাকে রক্ষা করার শেষ আশাটুকুও দপ করে নিভে যায়। তীর ঝড় এবং তুখোড় স্রোত তাকে ঠেলে নিয়ে চলে একটা মাথা উঁচু রীফ-এর দিকে, যেখানে পাহাড় সমান উঁচু সফেন ঢেউ বজ্রপাতের বিকট শব্দে আছাড় খেয়ে বিধ্বস্ত হচ্ছে।

রীফের সাথে ধাক্কা খেয়ে কিভাবে যেন আটকে যায় ভোরের আলো। ফাস্ট মেট বারলো তার বারোজন ক্রুর সাহায্যে একটা বোট নামাতে সমর্থ হয়। মিস শার্লোটসহ চারজন প্যাসেঞ্জার এবং বারোজন ক্রুকে নিয়ে বোটে নামে বারলো। নাবিক হিসেবে তার আশ্চর্য দক্ষতা এবং ভাগ্যের বিস্ময়কর আনুকূল্যের সাহায্যে ফাস্ট মেট উন্মত্ত সাগর এবং মৃত্যু ফাঁদ-বহুল রীফ-এর মাঝখান দিয়ে একটা পথ করে নিতে সমর্থ হয়, বোট নিয়ে পৌঁছতে পারে। ইনশোর চ্যানেলের অপেক্ষাকৃত শান্ত পানিতে।

অবশেষে তারা একটা দ্বীপে গিয়ে ওঠে। এখানে তারা চারদিন সংগ্রাম করে সাইক্লোনটার সাথে।

সেই দ্বীপে তিনটে পাহাড় চূড়া দেখতে পায় বারলো। তার অসম সাহসের তুলনা পাওয়া ভার। ঝড় উপেক্ষা করে সর্বদক্ষিণ প্রান্তের চূড়ার মাথায় একা ওঠে সে। দ্বীপ, চূড়া এবং চূড়া থেকে রীফ-এর যে বর্ণনা পরে দিয়েছে বারলো তার সাথে হুবহু মিলে যায় ওল্ড মেন এবং গানফায়ার রীফ-এর চেহারা। এই বর্ণনা। থেকেই নিরো বুঝতে পারে ঠিক কি খুঁজছে সে-তিন চূড়া বিশিষ্ট একটা দ্বীপ, এবং প্রবাল প্রাচীরের একটা রীফ।

রীফ-এর চোয়ালে আটকে থাকা ভোরের আলোর বিয়ারিং নেয় চূড়া থেকে বারলো। প্রতিটি ঢেউ তাকে প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার করে দিতে চেষ্টা করছিল। দ্বিতীয় দিনে জাহাজের খোল। ভেঙে পড়তে শুরু করে। বারলোর চোখের সামনে ভোরের আলোর সামনের অর্ধেকটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙে যায় এবং স্রোতের টানে রীফ পেরিয়ে প্রবালের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা মুখ খোলা অন্ধকার গহ্বরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্টার্ন ধসে পড়ে, সাগর তাকে আছাড় মেরে দিয়াশলাই খোলার মত টুকরো টুকরো করে ফেলে।

অবশেষে সাগর শান্ত হয়, বাতাস থমকে দাঁড়ায় এবং মেঘের ঘোমটা থেকে বেরিয়ে আসে ঝকঝকে নীল আকাশ। বারলো হতাশ হয়ে আবিষ্কার করে জাহাজের একশো উনপঞ্চাশ জন আদম সন্তানের মধ্যে তার সতেরো জনের ছোট্ট দলটা ছাড়া আর একজনও বেঁচে নেই, বাকি সবাইকে গ্রাস করেছে সাগর।

পশ্চিম দিকে নিচু তীরভূমি দেখতে পায় বারলো। অনুমানে ধরে নেয় আফ্রিকান মেইনল্যান্ড ওটা। আরেকবার সে তার দল নিয়ে বোটে চড়ে, এবং ইনশোর চ্যানেল পাড়ি দেয়। তার অনুমান সত্য হয়- আফ্রিকা মহাদেশেরই তীরচিহ্ন ছিল ওটা। কিন্তু বরাবরের মত আফ্রিকার উপকূল পরম শত্রুর মত নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

সাগরে পথ হারানো সতেরো জন অভাগা বাঁচার তাগিদে ভয়ঙ্কর এক অভিযানে রওনা দেয়। তিনমাস পর চারজন নাবিক, বারলো এবং মিস শার্লোট কটন জাঞ্জিবার পোর্টে পৌঁছায়। জ্বর, হিংস্র জানোয়ার, লোভী মানুষ এবং দুর্ঘটনা এক এক করে কেড়ে নেয় দলের লোকদের। শেষ পর্যন্ত যারা বেঁচে গেল তাদেরকে মানুষ বলে চেনার উপায় ছিল না। কঙ্কালের গায়ে ঝুলছিল হলুদ চামড়া।

কোর্ট অভ এনকয়েরী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ফার্স্ট মেট এনড্র বারলোর। এবং স্টেট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার অসম সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ নগদ পাঁচশো পাউণ্ড দিয়ে তাকে সম্মানিত করে।

পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকালাম রাফেলার দিকে। আমাকে লক্ষ্য করছিল ও। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, দুঃখজনক, তাই না?

হ্যাঁ, একমত হলাম ওর সাথে। তারপর বললাম, বারলোর বর্ণনার সাথে সব মিলে যাচ্ছে, তাই না? তার মানে, রাফেলা, সব কার্গো আজও পড়ে আছে গানফায়ার রীফ-এর তলায়।

হুঁ, একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে।

এরপর আমরা তিনতলায় প্রিন্ট অ্যাও ড্রয়িংরুমে উঠে এলাম। একজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলতেই সে আমাদেরকে ভোরের আলোর নকশাটা খুঁজে বের করে দিল। এর একটা কপি দরকার আমার।

আগামীকাল বিকেলে পাব? অ্যাসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

দিতে চেষ্টা করব, কথা দিল লোকটা।

রাফেলাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। মনটা হালকা লাগছে। সূত্র ধরে অনেকদূর এগিয়ে এসেছি আমরা।

সাত

একটা পাবে ঢুকে বসলাম আমরা। সবে বিকেল, কিন্তু এরই মধ্যে তৃষ্ণার্তদের ভিড় জমে উঠেছে। দুটো ভারমুখের অর্ডার দিলাম আমি, এবং যে-যার গ্লাস তুলে ধরে পরস্পরকে স্যালুট করলাম।

বুঝলে, রানা, একশো একটা প্ল্যান ছিল নিরোর মাথায়। সাগরতলে পড়ে থাকা গুপ্তধন খোঁজ করার পেছনে জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল-কথাটা মোটেও অতিরঞ্জিত নয়। বহু কষ্টে ওর বলা গল্পগুলো অবিশ্বাস করার একটা অভ্যাস গড়ে নিই আমি। কিন্তু এই ব্যাপারটা... ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল রাফেলা।

কতটুকু কি জানি আমরা, এসো, বিবেচনা করে দেখা যাক, প্রস্তাব দিলাম ওকে।

কিছুই জানো না তুমি-আমার সম্পর্কে, হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রাফেলা।

তাড়াহুড়ো পছন্দ করি না আমি, বললাম। ধীরে ধীরে, কিন্তু তোমার সবটা একদিন ঠিকই জেনে নেব আমি, তুমি দেখে নিয়ো।

সেদিন রাগ করো না যেন আমার ওপর, হাসিটা একটু যেন ম্লান হল রাফেলার।

কাজের কথায় এসো, বললাম। আমরা জানি, কর্নেল গুডচাইল্ড তার লাগেজ নিরাপদ গুদামে রাখতে বলেছিল। জানি, এই লাগেজ সে ভোরের আলো জাহাজে করে পাঠিয়েছিল ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে, এবং পাঠাবার আগে একজন ক্যাপ্টেন বন্ধুর হাতে চিঠি দিয়ে এজেন্টকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিল। ঠিক?

ঠিক।

ভোরের আলো গানফায়ার রীফ-এর কাছে ডুবে যায়। ধরে নেয়া যেতে পারে সেই সাথে তার সব কার্গোও ওখানে ডুবে যায়। ডুবে যাওয়ার নির্দিষ্ট জায়গাটাও আমরা চিনি। ভোরের আলোর নাম খোঁদাই করা বেলটা এ ব্যাপারে সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাবে। ঠিক?

পুরোপুরি ঠিক।

আমরা শুধু জানি না ওই পাঁচটা কেসে কি আছে।

নোংরা মোজা।

মনে রেখো, ওগুলোর ওজন চার টন। এমন কি চার টন নোংরা মোজার দামও খুব কম নয়। যাই হোক, কি আছে ওগুলোয় তা আমরা জানি না। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, নিরো জানত। নেকড়ের দলকে পুঁজি খাটাবার জন্যে শুধু গল্প শুনিয়ে রাজি করানো সম্ভব ছিল না, ওদেরকে কিছু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখাতে হয়েছিল এবং নিরো তা দেখিয়েওছিল, তা নাহলে গোটা ব্যাপারটা অমন সিরিয়াসলি নিত না নেকড়ের দল।

এবং এমনই সিরিয়াসলি নিল যে ওরা নিরোকে পর্যন্ত... গলা বুজে এল রাফেলার। নিরোর করুণ মৃত্যু কল্পনা করে শিউরে উঠল ও।

চোখ সরিয়ে নিলাম ওর দিক থেকে। পরিবেশটা হালকা করার স্বার্থে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে টেবিলে রাখলাম। সযত্নে ভাঁজ খুলে। আবার যখন তাকালাম ওর দিকে, নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে দেখে শ্রদ্ধা হল ওর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ওপর।

মার্জিনের নোটটা আবার আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। B. Mus. E 6914 (8), মৃদু শব্দে পড়লাম আমি। কিছু বুঝতে পারছ?

ব্যাচেলর অভ মিউজিক।

এত থাকতে... হেসে উঠলাম আমি।

এর চেয়ে ভাল একটা অর্থ বের করো তো দেখি, চ্যালেঞ্জ করল ও আমাকে।

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দিলাম যথাস্থানে, তারপর আরেক প্রস্থ অর্ডার দিলাম ভারমুথের। এটার কথা আপাতত বাদ দাও, ওকে বললাম। আরেকটা সূত্র আছে আমার কাছে, এসো, সেটা নিয়ে একটু মাথা ঘামানো যাক। শুধু মাথা ঘামানোয় কাজ হবে। না, এবার একটু নড়েচড়ে দেখতেও হবে।

ভুরু কুঁচকে চুপচাপ বসে থেকে উৎসাহিত করল আমাকে ও।

তোমার ছদ্ম পরিচয়ধারিণী আরেক রাফেলা বার্ডের কথা বলেছি তোমাকে, তাই না? নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ও। দ্বীপ ত্যাগ করার আগের রাতে একটা টেলিগ্রাম পাঠায় সে লগুনে। মানিব্যাগ থেকে টেলিগ্রামের ডুপ্লিকেট কপিটা বের করে দিলাম ওকে। ও পড়ছে, আবার আমি শুরু করলাম, সব ঠিকঠাক মত ঘটছে, এই সার বার্তাটা জানানো হয়েছে সাতানব্বই নাম্বার কার্জন স্ট্রীটের পাঁচ নাম্বার

সিডনি ফ্ল্যাটের মালিককে, তাই না? সিডনি ফ্ল্যাটের এই মালিক লোকটাই হতে পারে পালের গোদা। আমি ঠিক করেছি, এই সিডনিকে একটু দেখে নেব। গ্লাসের ভারমুখটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করলাম, তারপর ওকে বললাম, এখন তোমাকে আমি তোমার আঙ্কেলের কাছে জমা রেখে আসব। কাল আবার বুঝে নেব তার কাছ থেকে।

মাসুদ রানা, দৃঢ় স্বরে, কিন্তু সহাস্য বলল রাফেলা, আমাকে পুতুল মনে করে থাকলে মারাত্মক ভুল করবে তুমি। জড়িয়ে যখন গেছি, তোমার সাথে নরক পর্যন্ত যাব আমি, যদি দরকার হয়।

এমন অলঙ্করণে কথা ফের যদি মুখে আনো তার পরিণতি ভাল হবে না, স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ওকে। আমার সাথে স্বর্গে যাওয়ার দরকার হবে তোমার, নরকে নয়।

তাও বোধহয় যাব, যদি দরকার হয়।

এভাবে কথা বোলো না, আবেদনের সুরে বললাম ওকে, মারাত্মক আশাবাদী হয়ে উঠতে লাভ জাগে।

বার্কলে স্ট্রীটে ট্যাক্সি থেকে নামলাম আমরা। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে চলে এলাম কার্জন স্ট্রীটে।

আমাকে জড়িয়ে ধর, কুইক! ফিসফিস করে বললাম ওকে, উত্তেজিতভাবে ঘাড়ের ওপর দিয়ে দ্রুত একবার পেছন দিকে তাকালাম।

দ্রুত নির্দেশ পালন করল রাফেলা। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পঞ্চাশ গজ এগোবার পর নিচু গলায় জানতে চাইল ও, কেন?

কারণ, তোমার স্পর্শ ভাল্লাগে, সহাস্য বললাম আমি।

ওরে পাজী! নিজেকে আমার বাহু থেকে ছাড়িয়ে নিতে একটু চেষ্টা করল ও, কিন্তু আমি আরও চেপে ধরতেই ঢিল করে দিল হাত দুটো।

ধীর পায়ে শেফার্ড মার্কেটের দিকে এগোচ্ছি আমরা, মাঝেমধ্যে উইগো-শাপের সামনে দাঁড়াচ্ছি-ঠিক যেন একজোড়া টুরিস্ট।

সাতানব্বই নাম্বার কার্জন স্ট্রীট ছয়তলা উঁচু অত্যাধুনিক একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি, বোঞ্জ আর কাচ দিয়ে তৈরি রাস্তার ধারের দরজার ওপারে সাদা মার্বেল পাথরের উঠান এবং সেন্ডি বক্সে একজন উর্দিপরা দারোয়ানকে দেখতে পেলাম আমরা। দরজার সামনে দাঁড়ালাম না, পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেলাম হোয়াইট

এলিফ্যান্ট ক্লাব পর্যন্ত, তারপর রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের। পেভমেন্ট ধরে ফিরে আসতে শুরু করলাম আবার।

যাব আমি? জানতে চাইল রাফেলা। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস। করব পাঁচ নাম্বার ফ্ল্যাটে মি. সিডনি থাকেন কিনা?

চমৎকার, বললাম। দারোয়ান হ্যাঁ বললে তখন কি করবে তুমি? বলবে মাসুদ রানা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে?

ভারি বুদ্ধিমান মনে করো নিজেকে তুমি, কথাটা বলে আরেকবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল রাফেলা, কিন্তু এবার আগের চেয়েও হালকাভাবে।

সাতানব্বয়ের ঠিক উল্টোদিকে ওটা কি দেখতে পাচ্ছ? জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

একটা রেস্টোরা।

চল, ওখানে ঢুকে জানালার সামনে একটা টেবিলে বসা যাক। কফিও খাব, নজরও রাখব। ভাগ্যে কিছু একটা ছিঁড়তেও পারে।

জানালার ধারে বসে গল্প জুড়ে দিলাম আমি। ইচ্ছে করেই খুব বড় একটা গল্প ধরেছি, যাতে সময়টা কাটে। আবিষ্কার করলাম আমার কথার মধ্যে প্রচুর হাস্যরস থাকে, অন্তত রাফেলাকে বারবার খিলখিল করে হেসে উঠতে দেখে তাই মনে হল আমার। যাই হোক, ওর হাসিটা যে-কোন ক্ষতিমধুর যন্ত্রসঙ্গীতের সমতুল্য, শোনার লোভটা ছাড়তে রাজি নই বলে গল্পটা মাঝপথে থামিয়ে দিলাম না। এভাবে একঘন্টার ওপর কেটে গেল। এবং আমি যখন গল্পের মাঝখানে পৌঁছেছি, এই সময় উল্টোদিকের ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড রূপালী মাছের মত এসে থামল একটা রোলস রয়েস। ডাভ-গ্রে রঙের উর্দিপরা শোফার। নামল সেটা থেকে, দরজা পেরিয়ে মার্বেল পাথরের উঠানে ঢুকল। কথা বলছে দারোয়ানের সঙ্গে।

গল্প থেমে গেছে আমার।

দশ মিনিট পর রাস্তার ওপারে অকস্মাৎ দারুণ তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। ঘন ঘন নামছে আর উঠছে এলিভেটর, প্রতিবার নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি লাগেজ, সেগুলো শোফার এবং দারোয়ান ধরাধরি করে তুলছে রোলসে। এর কোন বিরাম নেই। এক সময় মন্তব্য করল রাফেলা, কেউ বোধহয় লম্বা ছুটিতে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় একটা দ্বীপ, দ্বীপটাকে ঘিরে নীল সাগর, চিকচিক করছে সাদা বালি, পাম গাছের মাঝখানে লাল টালির একটা শান্তির নীড়, হু হু বাতাস...

থামো, মরে যাব! করুণ মিনতির সুরে বলল রাফেলা। গরমের দিনে লগুনে বসে এসব কল্পনা করলেও পাগল হয়ে যাব আমি।

এই সময় আমার চোখে পড়ল এলিভেটরটা আবার নেমে এসেছে, খুলে যাচ্ছে কাঁচের দরজাটা। একপাশে সরে দাঁড়াল দারোয়ান। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক এবং একটা মেয়ে।

আজানুলস্থিত লালচে একটা মিস্ত্রি পরে আছে মেয়েটা, তার সোনালি চুল মস্ত একটা চূড়ার মত স্তূপ হয়ে আছে মাথার ওপর। ওকে চিনতে পেরেই রাগের প্রচণ্ড একটা চাবুকে শরীরটা ঝুঁকি খেল আমার।

এক নাম্বার রাফেলা বার্ড ও। যার কল্যাণে জুড়িখ এবং জলকুমারী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গ্র্যাণ্ড হারবারের তলায়।

ওর সাথে লোকটা মাঝারি আকারের, মাথায় নরম ব্রাউন রঙের চুল, কানের দুপাশ দিয়ে লম্বা হয়ে নেমে এসে পাক খেয়ে ছোট ছোট গোল চাকার মত আকৃতি পেয়েছে। পরনে অত্যন্ত দামি সুট। ভারী চোয়াল লোকটার, লম্বা এবং মাংসল নাক, চোখ দুটো শান দেয়া ছুরির ফলার মত, মুখের সর্বত্র অদ্ভুত এক ক্ষুধার্ত ভাব। মুখের এই ভাবটা দেখামাত্র চিনলাম ওকে, তলপেট শিরশির করে উঠল আমার। পরমুহূর্তে আক্রোশে কেঁপে উঠলাম আমি। আমার সমস্ত দুর্দশার জন্যে দায়ী এই লোক।

শেরিডান! অনুভব করলাম আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। সিডনি শেরিডান! তুমিই তাহলে! বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে ছটফট করছিল নিরো, এবং ব্যাপারটা আর কারও চোখে না পড়লেও সিডনি শেরিডানের চোখে ঠিকই পড়ে যায়। লাভের ব্যাপার হাজার মাইল দূর থেকেও দেখতে পায় শেরিডান।

পেভমেন্ট পেরিয়ে রোলসের দিকে এগিয়ে আসছে সে। পেছনের দরজা খুলে স্বর্ণকেশীর পাশে বসল।

এখানে অপেক্ষা করো, হঠাৎ খেয়াল হতেই দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম এরই মধ্যে পার্ক লেনের দিকে ছুটতে শুরু করেছে রোলস।

দৌড়ে পেভমেন্টে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সির জন্যে এদিকওদিক তাকাচ্ছি। নেই। দেরি না করে ছুটলাম রোলসের পিছু পিছু। মরিয়া হয়ে আশা করছি মাথার ওপরের আলো জ্বালা একটা কালো

ট্যাক্সি এস্ফুনি দেখতে পাব আমি। কিন্তু আশাটা পূরণ হল না। সামনে দেখতে পাচ্ছি এখনও রোলসটাকে, বাঁক নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অডলি স্ট্রীটে।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম রেস্টোরার সামনে, ইতিমধ্যে পেভমেন্টে বেরিয়ে এসেছে রাফেলাও। ওর কথাই ঠিক, সিডনি। শেরিডান এবং তার স্বর্ণকেশী বান্ধবী লম্বা ছুটি কাটাতে চলে গেল। মনে মনে ঠিক করলাম আবার যখন লগুনে এসেছি, ওর বিরুদ্ধে যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ সময়ের অভাবে তখন জোগাড় করতে পারিনি এই সুযোগে সেগুলো জোগাড় করে নিতে হবে। আমাকে। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ভুল ভাঙাবার, নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করার এটাই আমার শেষ সুযোগ। আমার। ভবিষ্যৎ জীবনের উত্থান-পতন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এই সুযোগের সঠিক সদ্ব্যবহার করার ওপর।

এসবের মানে কি? একটু জেদের সুরে ব্যাখ্যা দাবি করল রাফেলা।

ওর হাত ধরে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। বার্কলে স্ট্রীটের দিকে এগোচ্ছি আমরা। ব্যাপারটা ভেঙে বললাম ওকে।

যে লোকটাকে দেখলে, সে-ই সম্ভবত নির্দেশ দিয়েছিল নিরোকে খুন করার। আমার বুকের অর্ধেক উড়িয়ে দেবার পেছনে এ-ই দায়ী। তোমার সুন্দর আঙুলগুলোও এই লোকের নির্দেশেই সেদ্ধ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই লোকই পালের গোদা।

ওকে তুমি চেনো?

সিডনি শেরিডানের গল্প তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। এরই মধ্যে তা ভুলে গেছ? এরই ডায়মণ্ড কেড়ে নিয়েছিলাম আমি।

না, ভুলিনি। এ-ই সেই লোক?

হ্যাঁ।

আর মেয়েটা? এই বুঝি সেন্ট মেরীতে গিয়ে তোমার জলকুমারী আর তোমার ক্রুর ভাবী স্ত্রী জুডিথকে খুন করেছে?

সেই প্রচণ্ড রাগটা আবার ফিরে এল আমার মধ্যে। ব্যথায় কাতরে উঠল রাফেলা। রানা, ছাড়ো...লাগছে হাতে!

দুঃখিত, হাতটা চোখের সামনে তুলে দেখল রাফেলা, বলল, ইস, দাগ বসে গেছে।

আশা করি এ-থেকেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছ।

তু-তুমি পুলিশের কাছে যাচ্ছ না কেন?

সিডনি শেরিডান এবং ওই মেয়েটা আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি করেছে-ওদের ব্যবস্থা আমি ব্যক্তিগতভাবে করতে চাই। তাছাড়া পুলিশের কিছু করার নেই এ ব্যাপারে। কোন প্রমাণ নেই আমার কাছে ওদের বিরুদ্ধে। বরং পুলিশের কাছে কিছু তথ্য-প্রমাণ রয়েছে আমার বিরুদ্ধে।

কি করতে চাও এখন তুমি?

একটু চিন্তা করতে চাই।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। উইগ্‌সোর আর্মস পর্যন্ত নিঃশব্দে হেঁটে এলাম আমরা। প্রাইভেট বারটা ওক কাঠ দিয়ে ঘেরা। এক কোণে একটা টেবিল পেলাম আমরা।

কি চিন্তা করলে?

ছুটি কাটাতে কোথায় গেল ওরা তা আমি অনুমান করতে পারছি, বললাম।

বিগ গাল আইল্যান্ড? জানতে চাইল রাফেলা। আমাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে আবার বলল, একটা বোট এবং ডাইভার দরকার হবে ওদের।

দুশ্চিন্তা কোরো না, সিডনি ওসব জোগাড় করে নেবে।

এখন বল, আমরা কি করব?

আমরা? জানতে চাইলাম।

কথার কথা বলছি, দ্রুত নিজেকে সংশোধন করে নিল রাফেলা, তুমি কি করবে?

দুটো পথ খোলা দেখতে পাচ্ছি সামনে, বললাম। এক, সব ভুলে যেতে পারি। দুই, গানফায়ার রীফে ফিরে গিয়ে জানার চেষ্টা করতে পারি কর্নেল গুডচাইল্ডের পাঁচটা বাক্সে কি আছে।

সাজ সরঞ্জাম দরকার হবে তোমার।

সেগুলো হয়ত সিডনির মত দামি আর অত আধুনিক হবে না, কিন্তু জোগাড় করতে পারব।

পকেটের কি অবস্থা তোমার, নাকি অযাচিত হয়ে গেল প্রস্তুতি?

উত্তর ওই একই, জোগাড় করতে পারব।

নীল সাগর আর সাদা বালি, কল্পনা করতে গিয়ে চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল রাফেলার।

আর উথালপাথাল চেউয়ের মাথায় চড়ে...

থামো, রানা! ককিয়ে উঠল রাফেলা।

মোটাতাজা ক্রাইফিশ গনগনে কয়লার আগুনে ঝলসানো হচ্ছে, চাঁদ উঠেছে আকাশে, উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে তোমার পাশে হেঁড়ে গলায় গান গাইছি আমি, বললাম।

পাষণ!

এখান থেকে যদি না নড়ো, জানতেই পারবে না ওগুলো সত্যি নোংরা মোজা কিনা। ওর একটা হাত ধরলাম আমি।

চিঠি লিখে জানিয়ে আমাকে।

না, তা জানাব না।

তাহলে মনে হচ্ছে তোমার সাথে যেতেই হবে আমাকে।

লক্ষ্মী মেয়ে, ওর হাতে চাপ দিলাম।

কিন্তু, রানা, যাবার খরচ আমারটা আমিই বহন করব, তোমার কেপ্ট হয়ে যেতে রাজি নই।

বুঝলাম, আমার আর্থিক দীনতার কথা অনুমান করতে পেরেছে ও। তুমি যাতে রাজি নও আমিও তাতে রাজি হতে পারি না, খুশি হয়ে বললাম আমি, এবং আমার মানিব্যাগের স্বস্তির নিঃশ্বাসটা প্রায়

স্পষ্ট শুনতে পেলাম বলে মনে হল। গানফায়ার রীফ অভিযানের ব্যয়ভার বহন করতে হলে প্রায় নিঃশ্ব হয়ে যাবো আমি।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, সুতরাং কথা বলার অনেক বিষয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমাদের মাঝখানে। বার যখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে, হঠাৎ আমার হুঁশ ফিরল। রিস্টওয়াচ দেখলাম। রাত দশটা।

রাতের বেলা রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়, রাফেলাকে ভয় দেখালাম আমি। ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে বলে মনে করি না। ওপরে দারুণ আরামদায়ক একটা কামরা রয়েছে আমার, জানালা দিয়ে এমন সুন্দর দৃশ্য...

ওঠো, রানা, ঝট করে চেয়ার ছাড়ল রাফেলা। ভাল চাও তো আমাকে পৌঁছে দাও বাড়িতে, তা নাহলে আমার আঙ্কেলকে লাগাব তোমার পেছনে। জীবন হেল করে ছেড়ে দেবে।

আঁতকে ওঠার ভান করে ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম। বাইরে। অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই ঠিক হল কাল লাঞ্চার সময় আবার আমরা দেখা করব। প্লেনের টিকেট কাটব, এবং ব্যক্তিগত অন্যান্য কিছু কাজ সারব সকালের দিকে আমি, আর। রাফেলা ওর পাসপোর্ট রিনিউ করবে, তারপর ভোরের আলোর ফটোস্ট্যাট ভ্রুয়িংটা সংগ্রহ করবে।

বাড়ির সামনে পরস্পরের মুখোমুখি হলাম। আমরা হঠাৎ দুজনেই বিষন্ন হয়ে উঠেছি। কথা না বলে পরস্পরের দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম যে একসময় হেসে ফেললাম আমি। হেসে ফেলল রাফেলাও।

গুডনাইট, রানা, পরিণত যুবতীর সুনিপুণ ভঙ্গিতে অদ্ভুত একটু হাসল রাফেলা, মুখটা বাড়িয়ে দিল এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ। বুঝলাম, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চুমো খাবার অনুমতি দিচ্ছে ও আমাকে।

আশ্চর্য নরম আর উষ্ণ ওর ঠোঁট। এবং জানি না কতক্ষণ অধরসুধা পান করলাম আমি।

ছ-ছাড়! ফিসফিস করে বলল ও। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

ঠিক জান, সিদ্ধান্ত পাল্টাচ্ছে না? বিশ্বাস কর, কামরাটা খুবই সুন্দর, ঠাণ্ডা এবং গরম পানি, মেঝেতে কার্পেট, টিভি...

হাসির দমকে শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে রাফেলার, মৃদু ধাক্কা দিয়ে পিছু হটিয়ে দিল আমাকে ও। গুডনাইট, ডিয়ার রানা, আবার বলল, এবং আমাকে একা ফেলে রেখে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

ফেরার সময় ক্লান্ত লাগছে। ভাবছি সারারাত আজ ঘুম এলে হয়। একবার নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে, রাফেলার দেখা পাওয়াতেই যেন ধন্য হয়ে গেছে আমার জীবন; আরেকবার নিজেকে অভাগা মনে হচ্ছে, চাইলেই আমি ওকে পেতে পারি না।

রাস্তাটা জনশূন্য, ফাঁকা। তবে পেভমেন্টের ধারে সার সার দাঁড়িয়ে আছে পার্ক করা গাড়ি, যতদূর দেখা যায়।

ক্লান্ত কিন্তু বিছানায় গিয়ে ওঠার ব্যস্ততা অনুভব করছি না, বরং মনে হচ্ছে এই পথ দিয়ে খানিক আগে গেছে রাফেলা, তাই যতক্ষণ পারা যায় এই পথ দিয়ে হাঁটি, বাতাস থেকে ওর গায়ের গন্ধ নিই। এ এক আশ্চর্য মেয়ে, এবং যতই ভাবছি ওর কথা ততই ভাবতে ভাল লাগছে, ততই মন এবং শরীরের দিক থেকে সুস্থ হয়ে উঠছি আমি।

রাফেলা বার্ড সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার অনেক কিছু রয়ে গেছে। ওর অনেক ব্যাপার বুঝিনি এখনও, ব্যাখ্যা পাইনি। তবে তবু কেন যেন মনে হচ্ছে এই প্রথম সম্ভবত একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে যা এক রাত, এক হপ্তা অথবা এক মাসের চেয়ে অনেক, অনেক বেশিদিন টেকসই হবে।

হঠাৎ আমার পাশ থেকে একজন বলল, রানা! পুরুষের গলা। অপরিচিত। নিজের অজান্তেই সেদিকে ফিরলাম আমি। এবং সাথে সাথে বুঝলাম, ভুল হয়ে গেল।

পার্ক করা একটা গাড়ির ব্যাক সিটে বসে আছে লোকটা। কালো রঙের রোভার গাড়িটা। জানালাটা খোলা, ভেতরে মুখটা পরিষ্কার নয়, ভৌতিক, অস্পষ্ট।

মরিয়া হয়ে হাত দুটো ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করছি আমি, সেই সাথে যদিও থেকে আক্রমণটা আসবে বলে জানি সেদিকে ঘুরে যাচ্ছি। ঘোরার মধ্যেই একপাশে সরিয়ে নিলাম মাথাটা এবং মোচড় খেয়ে একটু কাত করে ফেললাম শরীর। কানের পাশ দিয়ে কি যেন নামল বাতাস কেটে, প্রচণ্ড একটা বাড়ি খেয়ে অসাড় হয়ে গেল কাঁধটা।

বিদ্যুৎগতিতে আধপাক ঘোরা শেষ করেই দুই কনুই চালালাম আমি, নরম কিছু সাথে হল সংঘর্ষটা, সাথে সাথে ব্যথায় কাতরে উঠল কেউ।

হাত দুটো মুক্ত হতেই সিঁধে হলাম। দ্রুত সরে যাচ্ছি। এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে দিক বদলাচ্ছি। জানি, বালি ভর্তি ভারী বস্তুটা আবার ব্যবহার করবে ওরা।

ঘন কালো দানবের ছায়া কয়েকটা, এর বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই কালো পোশাক পরে আছে। পথ আগলাবার জন্যে আমার সাথে ছোটোছুটি করছে ওরা অন্ধকারে, বিরাট একটা দল বলে মনে হচ্ছে-অথচ সংখ্যায় ওরা মাত্র চারজন। আর গাড়ির ভেতর রয়েছে আরেকজন।

ওরা সবাই বিশালদেহী। বস্তুটা নিয়ে ছুটে এল আবার একটা ছায়ামূর্তি। ভগ্নি করলাম একপাশে সরে যাবার, কিন্তু সাঁাত করে এগিয়ে গেলাম তার দিকেই। হাতের তালু দিয়ে প্রচণ্ড একটা থাবড়া বসিয়ে দিলাম তার নাকের ওপর। মাথাটা পেছন দিকে ছিটকে গেল, অনুমান করলাম ভেঙে গেছে হাড়টা। কংক্রিটের পেভমেন্টে দড়াম করে পড়ল সে।

একটা ভাঁজ করা হাঁটু আমার তলপেটে এসে লাগল, কিন্তু একই সময়ে উরুটা ধরে ফেলেছি আমি দুই হাত দিয়ে-মোচড় দিতেই ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই। একটা হাত আমার গলা পেঁচিয়ে ধরল পেছন থেকে। কনুই চালাতে যাব এই সময় ডাইভ দিয়ে পড়ল একজন। হাঁটুর নিচে ধাক্কা খেলাম আমি, ভারসাম্য হারিয়ে পিঠে ঝুলে থাকা লোকটাকে নিয়ে পড়ে গেলাম পেভমেন্টের ওপর।

আমার চেয়ে আগে উঠে দাঁড়াল ওরা। বসতে যাচ্ছি, ঘাড় পড়ল দুই হাতের এক মন চাপ।

স্থির করে রাখো ওকে, দ্রুত চাপা কণ্ঠে বলল কেউ। মাত্র একটা ঘা বসাতে দাও আমাকে।

দুজন চেপে ধরেছে আমাকে। পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছি, এই সময় বালির বস্তু নিয়ে এক পা এগোল লোকটা, পরমুহূর্তে মাথার পাশে বাড়িটা খেলাম।

জ্ঞান হারাইনি। কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে গেছি। সদ্যোজাত শিশুর মত দুর্বল।

হয়েছে। গাড়ির পেছনে তোলো এবার।

চ্যাঙদোলা করে তুলল আমাকে ওরা। রোভারের ব্যাকসিটে বসিয়ে দিল, দুপাশে উঠে বসল দুজন লোক। সামনের সিটে ড্রাইভারের দুপাশে উঠে পড়েছে ইতিমধ্যে বাকি দুজন। খটাং করে দরজা বন্ধ হবার ঝুঁকিতে ঘাড়ের ওপর নড়বড়ে মাথাটা দুলে উঠল আমার। ইঞ্জিন স্টার্ট নিল, তারপরই ছুটতে শুরু করল গাড়ি। মাথাটা কাঁপছে থরথর করে।

কতক্ষণে জানি না, কাঁপুনিটা থেমে গেল মাথার, আঘাতের ধাক্কা সামলে এখন চিন্তাও করতে পারছি, কিন্তু মাথার একটা পাশ, অনুভব করছি, অসাড় হয়ে আছে।

এখনও ওরা হাঁপাচ্ছে। ড্রাইভারের পাশের লোকটা খুব হালকা হাতে নিজের ঘাড় আর চোয়াল ডলছে। আমার বাঁ দিকে বসা লোকটার মুখ থেকে রসুনের তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে ফুঁ দিচ্ছে সে-আসলে আমাকে সার্চ করছে আর হাঁপাচ্ছে।

ইঁদুর মরে পচে আছে মুখের ভেতর, অ্যাডিনেও ওটা ফেলনি কেন? মাথার ব্যথা ভুলতে চাই, তাই কিছু একটা বললাম আর কি।

শুনতে না পাবার ভান করে সার্চ করে যাচ্ছে লোকটা। অবশেষে নিশ্চিত হয়ে নিজের জায়গায় গুঁহিয়ে বসল সে।

পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল। নদীর কিনারা ঘেঁষে হ্যামারস্মিথের দিকে ছুটছে গাড়ি।

ওদের ব্যথা এবং হাঁপানি একটু কমতে নিস্ক্রান্ত ভাঙল ড্রাইভার।

শোনো, মি. শেরিডান কথা বলতে চান তোমার সাথে, কিন্তু বলেছেন সেটা খুব একটা জরুরী কিছু নয়। একটু কৌতূহল আছে তাঁর, এই পর্যন্ত। বলে দিয়েছেন, গোলমাল করলে নদীতে ফেলে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে।

এমন সহজ সরল লোক হয় না, স্বীকার করি, বললাম আমি।

শাট আপ! বলল ড্রাইভার। বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। লক্ষ্মী হয়ে থাকো, কিছুটা হলেও বাড়বে তোমার আয়ু-তাই বা খারাপ কি! শুনেছি, রানা, তুমি নাকি সাংঘাতিক শার্প একজন অপারেটর। দ্বীপে লোরনা তোমাকে ছুঁতে পারেনি জানার পর আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তুমি উদয় হবে। কিন্তু স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি চকচকে একটা পেনির মত কার্জন স্ক্রিটের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত গড়াগড়ি খাবে। মি. শেরিডান তো ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে চাননি। তিনি বললেন, এ লোক মাসুদ রানা হতে পারে না-যদি হয়, মনে করতে হবে, লোকটা বোকা জাতের নরম মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। ইস্, মহাপরাক্রমশালীদের পতন কি মর্মান্তিক!

কি করণ! বলল রসুনের দুর্গন্ধ।

শাট আপ! বলল ড্রাইভার। তারপর আবার শুরু করল, মি. শেরিডান দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে দুঃখে কাতর হয়ে কেঁদেকেটে বুক ভাসাচ্ছেন-বুঝতেই পারছ।

অন্যায়সে।

শাট আপ!

রাত দুটোর সময় ব্রিস্টলে ঢুকল গাড়ি। শহরের মাঝখানটাকে পাশ কাটিয়ে এ-ফোর ধরে অ্যাভনমাউথের দিকে যাচ্ছি আমরা।

ইয়ট বেসিনে অন্যান্য বোটের সাথে বড় একটা মোটর ইয়ট দেখতে পেলাম, জেটিতে নোঙর ফেলা, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক নামানো। স্টার্ন এবং বো-তে নাম আঁকা রয়েছে-বুমেরাং। সমুদ্রগামী ইয়ট এটা, ইস্পাতের তৈরি খোল, সাদা এবং নীল রঙের। দেখেই বুঝলাম, অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী ইয়ট, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর যেকোন জায়গায় যেতে পারবে। ধনী লোকের শখের জিনিস। তার প্রায় সব পোর্টহোলেই আলো জ্বলছে। লোকজন দেখা যাচ্ছে ব্রিজে। রওনা দেবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

ছোট্ট জায়গাটা পেরিয়ে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে নিয়ে যাবার সময় ঘিরে রাখল আমাকে ওরা। ডেকে যখন উঠছি, বাঁক নিয়ে চলে গেল রোভারটা।

সেলুনটা দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত সবুজ কার্পেট মোড়া, একই রঙের জানালার পর্দাগুলো ভেলভেটের। ফার্নিচারগুলো গাঢ় রঙের টিক আর পালিশ করা চামড়া দিয়ে তৈরি। মূল্যবান তৈলচিত্রের সমাবেশও কারও দৃষ্টি এড়াবার নয়।

আন্দাজ করলাম পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের কম হবে না এটার দাম। সম্ভবত চার্টার করা। হয়ত ছয় মাসের জন্যে ভাড়া নিয়ে সিডনি শেরিডান নিজের ক্লু নিয়োগ করেছে। সমুদ্রবিহারের প্রতি তার লোভ আছে বলে কখনও শুনিনি।

কার্পেটের মাঝখানে দলটার সাথে দাঁড়িয়ে আছি, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক তুলে ফেলার শব্দটা নির্ভুল চিনতে পারলাম আমি, তারপরই নোঙর ওঠাবার আওয়াজ পেলাম। ইঞ্জিনগুলো মৃদু গুঞ্জন তুলল। সেলুনের পোর্টহোলের দিকে তাকাতেই দেখলাম বন্দরের আলো পিছিয়ে যাচ্ছে। মুখ থেকে ধীরে ধীরে সরে সেভার্ন নদীর খরস্রোতে বেরিয়ে এল বুমেরাং।

অবশেষে হাজির হতে মর্জি হল সিডনি শেরিডানের। নীল সিল্কের একটা গাউন পরে আছে সে, ঘুম থেকে উঠে এসেছে, তাই ফোলা ফোলা লাগছে মুখটা, কিন্তু লালচে চুলের ছোট ছোট তাকগুলো চিরুনির সাহায্যে নিখুঁত করা হয়েছে। তার হাসিটা সাদা এবং ক্ষুধার্ত।

গুরু দয়াল, বলল সে, ওরফে মাসুদ রানা, জানতাম আমি, আবার একদিন দেখা হবে আমাদের।

হ্যালো, সিডনি। ভারতের সাথে তোমার বন্ধুত্ব এখন কোন পর্যায়ে, জানতে ইচ্ছা করে।

ঠিক এই জিনিসটার প্রশংসা করি আমি। ভাগ্য বিরূপ জানা সত্ত্বেও যে লোক রসিকতা করতে পারে তার সান্নিধ্য সত্যি রোমাঞ্চকর। সেলুনে ঢুকল স্বর্ণকেশী মেয়েটা, তার দিকে তাকাল সিডনি। এসো লোরনা।

এক নাম্বার রাফেলা ওরফে লোরনা আজও উগ্র প্রসাধন ব্যবহার করেছে। চোখ-ধাঁধানো রঙের মত জ্বলছে তার মুখ। মাথার ওপর টোপরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সাজানো চুলের স্তূপ। স্বচ্ছ সাদা একটা হাউজ গাউন পরে আছে সে, গলার কাছে লেস দিয়ে আটকানো।

লোরনা-লোরনা পেজ, বলল শেরিডান। আমার বিশ্বাস, এর সাথে পরিচয় আছে তোমার।

একটা অনুরোধ, সিডনি, জরুরী ভঙ্গিতে বললাম আমি।

ভুরু কুঁচকে উঠছে শেরিডানের।

এরপর যখন আমার সেবা যত্ন নিতে কাউকে পাঠাবে, ওকে বললাম, ভাল জাতের কোন মেয়েকে পাঠিয়ে। বুনো বিড়ালটা খামচে-কামড়ে আর রাখনি কিছু আমার।

ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে দেখে বুঝলাম রাগে পুড়ে যাচ্ছে শেরিডান। কিন্তু হাসছে লোরনা। দারুণ আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল, তোমার বোটের খবর কি, রানা? খুব ভালবাসতে তুমি জলকুমারীকে।

এখন আরও ভালবাসি, শেরিডানের দিকে তাকালাম আমি। কি করতে চাও, সিডনি? একটা সমঝোতায় আসতে পারি আমরা?

চেহারা দুঃখ আর বিষণ্ণতা ফুটিয়ে তুলল শেরিডান, এদিকওদিক মাথা দোলাল। পারি না রানা। পারলে খুশি হতাম, সত্যি খুশি হতাম-কিন্তু একমাত্র তুমিই আমার ভেতর-বাইরের অনেক খবর জানো-আরেকটু জানলেই বিপদে ফেলতে পারবে আমাকে। তুমিই বলো, সে ঝুঁকি আমার নেয়া উচিত? হাতে পেয়ে প্রাণের দুশমনকে কেউ ছেড়ে দেয়?

যদি কথা দিই...

প্রশ্নই ওঠে না, রানা, যেন আদর করে সান্ত্বনা দিচ্ছে সিডনি শেরিডান আমাকে। হ্যাঁ, বিবেচনা করতাম তোমার আর্জি, যদি বিনিময় করার মত কিছু থাকত তোমার হাতে। তাছাড়া, সাংঘাতিক সেন্টিমেন্টাল

তুমি। শুধু ভাবাবেগের বশে চুক্তি ভাঙবে তুমি, জানা আছে আমার। তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না। নিরো, জলকুমারী, দ্বীপবাসিনী সেই মেয়েটার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে রাজি হবে না তুমি। ভুলবে না নিরোর বোনটার কথা, যাকে খুন না করে উপায় ছিল না আমাদের...

রাফেলাকে খুন করার জন্যে যাদেরকে পাঠিয়েছিল সিডনি, তারা মারধোর খেয়ে পালিয়ে গেছে, নিজেদের ব্যর্থতার রিপোর্ট পর্যন্ত এখনও দেয়নি তাকে, এটা বুঝতে পেরে একটু আনন্দ পেলাম আমি।

চেষ্টা করলাম কণ্ঠস্বরটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার, শোনো, সিডনি, বর্তমানে আমি একটি মাত্র আদর্শে বিশ্বাসী।

কি সেটা?

বেঁচে থাকার আদর্শ। যদি দরকার হয়, অতীতের সব কথা ভুলে যেতে রাজি আমি। বিশ্বাস কর, না হয় মাফও চাইব।

হেসে উঠল সিডনি শেরিডান। বলল, বৃথা চেষ্টা করছ, রানা। তোমাকে যদি ভালভাবে না চিনতাম, বিশ্বাস করতাম তোমার কথা। দুঃখিত। তোমার সাথে কোন আপোস নয়।

তাহলে এত ঝামেলা করে আমাকে এখানে আনলে কেন?

এর আগে দুবার আদেশ পাঠিয়েছি কাজটা শেষ করার জন্যে, রানা। দুবারই ব্যর্থ হয়েছে ওরা। এইবার পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চেয়েছি আমি। কেপ টাউনের পথে গভীর পানি পাড়ি দিতে হবে আমাদেরকে, ওখানে কোথাও নামিয়ে দেব তোমাকে। ভেব না, কয়েক মন লোহা থাকবে তোমার সাথে যাতে ভেসে উঠতে না পার।

কেপ টাউন? জানতে চাইলাম। তারমানে ভোরের আলোর পেছনে নিজেই লেগেছ? অবাক কাণ্ড, তাই না? কি এমন থাকতে পারে পুরানো একটা বিধ্বস্ত জাহাজে?

না জানার ভান কোরো না, রানা। না জানলে এত ভোগাতে না তুমি আমাকে। হাসল শেরিডান। নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ না করাই ভাল, ভাবলাম আমি।

সে-জায়গায় আবার ফিরে যেতে পারবে বলে মনে কর তুমি? স্বর্ণকেশীকে প্রশ্ন করলাম। সাগর তো ছোটখাট কিছু নয়, তাছাড়া একই রকম দেখতে অসংখ্য দ্বীপ আছে ওদিকে। ঠিক কোনটা, চিনবে কিভাবে? তার চেয়ে আমাকে যদি গাইড হিসেবে নাও...।

দুঃখিত, রানা, বলল শেরিডান। বার-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, কেতাদুরস্ত ভদ্রতার খাতিরে ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, ড্রিঙ্ক?

স্কচ, বললাম ওকে।

আধগ্লাস স্কচ লুইস্কি নিয়ে এসে দিল আমাকে শেরিডান। তোমার কাছে লুকাব না ব্যাপারটা-আসলে, কি জানো, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত আন্তরিকতার সাথে বলল সে, এত ঝামেলা শুধু লোরনার সম্মানে নিতে হয়েছে আমাকে। মেয়েটাকে তুমি সাংঘাতিক চটিয়ে দিয়েছ, রানা। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কতটা বেগে আছে ও তোমার ওপর। কেন, তা জানি না। কিন্তু আমরা, তুমি আর আমি, যখন বিদায় নেব তখন সেখানে উপস্থিত থাকতে চেয়েছে লোরনা। এসব দুর্লভ ঘটনা চাম্ফুষ করতে সাংঘাতিক ভালবাসে ও। তাই না, ডারলিং? আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল শেরিডান। পুরুষ মানুষের অসহায় মৃত্যু ওকে নাকি প্রচণ্ড উত্তেজিত করে তোলে। সেকসুয়ালি।

দুই চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে সিডনির মুখের ওপর হাসলাম। হ্যাঁ, তুমিও জানো, আমিও জানি, ওকে উত্তেজিত করতে না পারলে বিছানায় একটা লাশ ও।

ঘুসিটা নিচের ঠোঁট খেঁতলে দিল আমার। তালা বন্ধ করে রাখা একে, মৃদু গলায় বলল শেরিডান।

টেনে হিঁচড়ে সেলুন থেকে বের করে ডেক ধরে বো-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে ওরা। তিত্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এখন লোরনাকে, আপাতত এইটুকু ভেবেই খুশি আমি।

আশ্চর্য কালো আর চওড়া দেখাচ্ছে নদীটাকে।

আট

বিজের সামনে, ফোক্যাসলের ওপর নিচু একটা ডেকহাউজ এবং একটা কম্প্যানিয়নওয়ে রয়েছে, একটা মইয়ের মাথায় গিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে সেটা। মইটা নেমে গেছে ছোট একটা লবিতে। ক্রুদের কোয়ার্টার এদিকে, খোলা দরজা পথে কেবিন এবং মেস দেখা যাচ্ছে।

বো-এর কাছে একটা ইস্পাতের মোটা পাত মোড়া দরজা, তাতে স্টেনসিল দিয়ে লেখা রয়েছে-ফোক্যাসল স্টোর। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ওরা আমাকে। ভারি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ক্লিক করে শব্দ হল তালা বন্ধ হবার।

ছয় ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া জায়গাটা। দুটো বাল্কেহেডের গায়েই সারিবদ্ধ স্টোরেজ লকার রয়েছে। গুমোট একটা ভাব।

আমার প্রথম চিন্তা যে-কোন ধরনের একটা অস্ত্র পাওয়া যায়। কিনা দেখা। লকারগুলোর তালা পরীক্ষা করে নিরাশ হলাম। কবাটগুলো এক ইঞ্চি পুরু ওক কাঠের, ভাঙতে হলে কুঠার দরকার। তবু কাঁধের ধাক্কা দিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম। জায়গাটা ছোট, তাই জোরের সাথে ধাক্কা মারাও সম্ভব নয়। কাজ হচ্ছে না। তবে শব্দের একটা প্রতিক্রিয়া ঘটল সাথে সাথে।

দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। চৌকাঠ থেকে যথেষ্ট পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন ক্রু, হাতে প্রকাণ্ড একটা পয়েন্ট ফরটিওয়ান ম্যাগনাম।

খামোকা কষ্ট দিচ্ছ নিজেকে, বলল লোকটা। তোমার কাজে লাগবে এমন কিছু নেই ওগুলোয়। পেছন দিকের দেয়ালের কাছে স্তূপ করে রাখা লাইফ-জ্যাকেটগুলো দেখাল সে। চুপচাপ বসে থাক ওখানে। ফের যদি কোন আওয়াজ শুনি, মনে করব ধোলাই দরকার তোমার। সাহায্যের জন্যে ওদেরকে ডাকব তখন। দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

নিঃশব্দে ফিরে এসে লাইফ-জ্যাকেটগুলোর ওপর বসলাম।

দরজার বাইরে গার্ড রাখা হয়েছে, ভাবছি আমি, অন্যান্যরাও রয়েছে কাছেপিঠে। লোকটা দরজা খুলবে, এ আমি আশা করিনি। ওকে দিয়ে আরেকবার খোলাতে হবে ওটা-কিন্তু সেবার যেভাবে হোক বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে। বুঝতে পারছি, সফল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঘরের দিকে নল তুলে ট্রিগার টিপতে হবে শুধু ওকে। ব্যর্থ হবার কোন কারণ নেই ওর।

যথাসম্ভব ওর কাছাকাছি পৌঁছুতে হবে আমাকে, সেজন্যে ওর চোখে ধুলো-অথবা ধোঁয়া দিতে হবে। ভুরু কুঁচকে লকারগুলোর দিকে তাকালাম আরেকবার, তারপর মনোযোগ দিলাম নিজের পকেটগুলোয়। প্রায় সব জিনিসই বের করে নিয়েছে ওরা। লাইটার, চুরুট, গাড়ির চাবি, পেন-নাইফ-এসব কিছুই নেই। থাকার মধ্যে ভাঁজ করা পাঁচ পাউণ্ডের তিনটে নোট, রুমাল আর কঙ্জিতে রয়েছে ঘড়িটা।

লাইফ-জ্যাকেটের স্ট্রপটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি। সেগুলো তুলে আরেক পাশে সরিয়ে রাখলাম। নিচে থেকে বেরুল ফলের একটা কাঠের বাছ। তাতে অর্ধেকটা সাবান, নাইলনের ফ্লোরবাশ, ক্লিনিং ব্যাগ, এবং এক বোতল স্বচ্ছ তরল পদার্থ দেখতে পাচ্ছি। ছিপি খুলে বোতলটা নাকের সামনে তুলে শ্বাস টানলাম। জিনিসটা বেনজিন।

আবার বসলাম। সদ্য পাওয়া সম্পদগুলো কিভাবে ব্যবহার করা যায় ভাবছি। কিন্তু চমকপ্রদ কোন বুদ্ধি আসছে না মাথায়।

আলোর সুইচটা দরজার বাইরে। মাথার ওপরের বালা মোটা কাঁচের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। আবার দাঁড়ালাম। বেয়ে-ছেয়ে লকারগুলোর অর্ধেকটা পর্যন্ত উঠে গেলাম, ঢাকনিটা খুলে পরীক্ষা করলাম বালবটা। ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি এখন।

মেঝেতে নেমে বেছে নিলাম ভারি একটা লাইফ-জ্যাকেট। রিস্টওয়াচের স্টীল স্ট্র্যাপের আঁকড়া দিয়ে তর্জনী ঢোকান মত একটা ফুটো করে নিলাম, তারপর ক্যানভাসটা টেনে ছিঁড়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলাম সাদা কাপোক। অনেকগুলো লাইফ-জ্যাকেটের ক্যানভাস ছিঁড়লাম। কাপোকের বেশ বড় সড় একটা স্ত্রপ তৈরি করলাম মেঝেতে। জিনিসটা তুলোর মত, তাতে বোতলের বেনজিন ঢালতে ভিজে সপসপে হয়ে গেল। এক মুঠো ভিজে কাপোক তুলে নিলাম আমি, তারপর লকারের গায়ে পা রেখে আবার উঠে দাঁড়ালাম।

বালবটা খুলে নিতেই অন্ধকার হয়ে গেল ঘরটা। শুধু স্পর্শ অনুভব করে কাজ করছি আমি। বেনজিন ভেজা নরম কাপোক ইলেকট্রিসিটি টার্মিনালগুলোর দিকে চাপ দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি। ব্যবহার করার মত কোন ইনসুলেশন নেই, তাই রিস্টওয়াচের স্টীল স্ট্র্যাপটা খালি হাতে নিয়ে ওটাকেই ব্যবহার করছি। অকস্মাৎ নীল আলো চমকে উঠল, বেনজিনে আগুন ধরে গেল সাথে সাথে, এবং একশো আশি ভোল্টের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লাম আমি ডেকের ওপর ক্যানভাসের স্ত্রপে, কাপোকের জ্বলন্ত বলটা এখনও রয়েছে আমার হাতে।

অস্পষ্টভাবে বিরক্তিসূচক চিৎকার ভেসে এল বাইরে থেকে। ফোকাসলের সমস্ত লাইটিং সিস্টেম বানচাল করে দিয়েছি আমি,

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। হাতের আগুনটা দ্রুত কাপোকের ভিজে স্টুপে ফেলে দিলাম আমি, দপ করে জ্বলে উঠল স্টুপটা। হাত থেকে আগুনের ফুলকি ঝেড়ে ফেলে নাক আর মুখ চেপে ধরলাম রুমাল দিয়ে। বেছে রাখা ভাল লাইফ-জ্যাকেটটা ছোঁ মেরে তুলে নিলাম আমি, দ্রুত দরজার পাশে এসে দাঁড়িলাম।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পুড়ে শেষ হয়ে গেল বেনজিন। জ্বলন্ত কাপোক থেকে হু হু করে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। ঘরটা ভরে গেছে এরই মধ্যে, ঝর ঝর করে পানি বেরিয়ে আসছে আমার চোখ থেকে। খুব ধীরে এবং সাবধানে, শ্বাস টানতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ফুসফুসে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে ঝাঁঝাল ধোঁয়া, থক থক করে অদম্য কাশির সাথে শিরদাঁড়া বেঁকে যাচ্ছে আমার।

পুড়ছে! কিছু পড়ছে! দরজার বাইরে চিৎকার করে উঠল গার্ডটা। দোহাই লাগে, আলোটা জ্বালার ব্যবস্থা কর, দূর থেকে কেউ চৈঁচিয়ে উঠল।

এবার আমার পালা। দুহাত দিয়ে ঘুসি মারছি ইস্পাতের দরজায়, আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দিলাম, আগুন! আগুন! জাহাজে আগুন ধরে গেছে! বাঁচাও! এর সবটাই অভিনয় নয়। ছোট্ট ঘরটার ভেতর ধোঁয়া এত ঘন হয়ে যাচ্ছে যে বুঝতে পারছি বড়জোর আর ষাট সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারব আমি, তারপরই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জ্ঞান হারাব।

দরজা খুলে ভেতরে টর্চের আলো ফেলল গার্ড। বাইরে অন্ধকার, কালো মূর্তিটা ছোটোছুটি করছে, গার্ডের হাতে টর্চ আর রিভলভারটা রয়েছে-এর বেশি কিছু দেখার অবকাশ পেলাম না।

ঘন, জমাট বাঁধা একটা কালো ধোঁয়ার মেঘ বেরিয়ে যাচ্ছে ঘরটা থেকে, সেটার মাঝখানে ঢুকে পড়লাম, তারই সাথে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমার ধাক্কা খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছে গার্ড, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল একটা গুলি। মাজল থেকে শিখা বেরিয়ে চারদিক আলোকিত করে দিল মুহূর্তের জন্যে, কম্প্যানিয়নওয়ার মইটা দেখতে পেলাম আমি।

বুলেটের আওয়াজ কালো মূর্তিগুলোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মইয়ের দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছি আমি, এই সময় তাদের একজন লাফ দিয়ে সামনে চলে এল আমাকে বাধা দেবার জন্যে। কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলাম তার বুকে, লিক হয়ে যাওয়া রিকশার চাকার মত শব্দ করে সব বাতাস বেরিয়ে এল তার ফুসফুস থেকে।

মারমার কাট-কাট শুরু হয়ে গেছে চারদিক থেকে। লবি পেরোবার সময় মইয়ের গোড়ায় আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছি। গতি না কমিয়ে এগোচ্ছি, সবটুকু জোর দিয়ে লোকটার পেটে লাথি চাললাম। মুহূর্তের জন্যে থামলাম আমি, লোকটাকে মইয়ের গোড়ায় শুয়ে পড়তে দিচ্ছি। এই সময় একটা টর্চের আলো লোকটাকে ছুঁয়ে ছুটে গেল একদিক থেকে আরেক দিকে। অজ্ঞান লোকটাকে চিনতে পারলাম। এ সেই রসুনের গন্ধ। মই বেয়ে ওঠার সময় একটু সাহায্য নিলাম ওর কাছ থেকে। ওর কাঁধে একটা পা রেখে সেটাকে স্প্রিংবোর্ডের মত ব্যবহার করলাম, লাফ দিয়ে উঠে গেলাম মইয়ের অর্ধেকটা।

গোড়ালির পেছনটা খামছে ধরল পেছন থেকে কেউ, পা ছুঁড়ে ছাড়িয়ে নিলাম আমি। পৌঁছে গেছি ডেক লেভেলে।

সরু রডের তৈরি মইয়ের ধাপে একটা মাত্র পা রয়েছে। আমার, এক হাতে লাইফ-জ্যাকেট, অপর হাত দিয়ে ধরে আছি হ্যাণ্ডরেইল-এই রকম অসহায় মুহূর্তে ডেকের দরজা পথে আরও একটা কালো মূর্তি এসে দাঁড়াল, এবং আচমকা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে জ্বলে উঠল সমস্ত আলো।

বালির বস্তা হাতে প্রকাণ্ডদেহী সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। আমার ওপরে, আঘাত করার জন্যে আমার মাথার ওপর বস্তাটা তোলার সময় হাসছে। আঘাতটা এড়িয়ে যাবার একমাত্র উপায় হ্যাণ্ডরেইল ছেড়ে দিয়ে পেছন দিকে ফোকাসলে পড়ে যাওয়া, যেখানে আক্রোশে লাফালাফি করছে একদল কালো মূর্তি।

পেছন দিকে তাকলাম। হ্যাণ্ডরেইলটা সত্যি ছেড়ে দিতে। যাচ্ছি। হঠাৎ আমার পেছন দিকে, নিচের ডেকে উঠে বসল। রিভলভারধারী লোকটা, ইয়টের দোলা সামলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করেই গুলি ছুঁড়ল।

ভারী সীসার বুলেটটা আমার কানের পাশ দিয়ে উঠে গেল। ওপরে দাঁড়ানো লোকটা ঝাঁকি খেল, তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, বুক স্পর্শ করল চিবুক। মাথা নিচু করে বুকের বাঁ দিক ঘেঁষা ফুটোটা অবাক বিস্ময়ে দেখছে যেন। এক সেকেন্ড এই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল লোকটা। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত এড়াবার জন্যে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিলাম আমি। লোকটা সটান পড়ে যাচ্ছে মইয়ের দিকে, তার পাশ ঘেঁষে সাঁাৎ করে উঠে এলাম ডেকে।

আমার পেছনে আবার গর্জে উঠল রিভলভার, হ্যাচের গায়ে লেগে ফেটে ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম বুলেটটাকে। তিন কদম ছুটে এসেই ডাইভ দিয়ে পেরিয়ে গেলাম রেইলটা, পেটের ভেতর জায়গা বদল করল নাড়িগুলো, ঝপাৎ করে পড়লাম কালো পানির বুকে।

প্রপেলারগুলো প্রচণ্ড আলোড়ন তুলছে পানিতে, সেই আলোড়নের মধ্যে পড়ে গেলাম আমি, সাঁ করে টেনে নিল আমাকে নিচে।

চামড়া ভেদ করে হাড়ে ঘষা খাচ্ছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। লাইফ জ্যাকেটটা পানির ওপর টেনে তুলল একসময় আমাকে। দিশেহারার মত নিজের চারদিকে তাকালাম। অনেক, অনেক দূরে কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে উপকূলের আলো-কিন্তু ওখানে সাঁতার কেটে পৌঁছানর কথা কোন পাগলও চিন্তা করবে না।

পানির ওপর চারপাশ ঘিরে মাথা উঁচু চেউ আমাকে আড়াল হয়ে থাকতে সাহায্য করছে। স্রোতটাও তীব্র। কিন্তু চেউগুলো শব্দের মতো আমাকে ওপর দিকে তুলেও ধরছে, যাতে ইয়ট থেকে ওরা সবাই আমাকে পরিষ্কার দেখতে পায়।

খোলা সাগরের দিকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বুমেরাং। সব আলো জ্বলছে তার, আলোকমালায় সজ্জিত প্রমোদতরীর মত লাগছে দেখতে। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাত আর পা ব্যবহার করে খুলে ফেললাম জুতো আর জ্যাকেট, তারপর লাইফ-জ্যাকেটের হাতায় হাত দুটো গলিয়ে দিলাম। আবার যখন তাকালাম, এক মাইল দূরে সরে গেছে বুমেরাং। কিন্তু হঠাৎ সে বাঁক নিতে শুরু করল। এবং ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল সাদা স্পটলাইটের সুদীর্ঘ বাহু। কালো সাগরের বুকে হালকাভাবে ঘুরছে, নাচানাচি করছে উজ্জ্বল আলোটা।

তীরচিত্রে দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম আমি। বুমেরাং পিছু ধাওয়া নাও যদি করে, ওখানে আমি পৌঁছুতে পারব না সাঁতার কেটে। কিন্তু একথাও ঠিক, চুপচাপ পানির ওপর ভেসে থাকারও কোন মানে হয় না। পশ্চিম মুখো স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম আমি।

ধীর গতিতে ফিরে আসছে বুমেরাং। স্পটলাইটের আলো দ্রুত সার্চ করছে একদিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত পানির উপরিভাগ। ক্রমশ এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এগোচ্ছি এখন, পানির ওপরটা ভেঙে গিয়ে সাদা ফেনা তৈরি হবার ভয়ে হাত পা ছুঁড়ছি না।

ইংলিশ গ্রাউণ্ডে বয়ার রাইডিং লাইটটা একটু আগে ভাটা শুরু হবার সাথে সাথে দিক বদল করেছে। স্রোতের টানে বুমেরাঙের পথ থেকে সরে এসেছি আমি, আমার সাথে সমান্তরাল রেখার ওপর এগিয়ে আসছে সে, স্পটলাইট দিয়ে খোলা পানি সার্চ করছে।

বয়ার রাইডিং লাইট এর বেশি আমার দিকে এগিয়ে আসার অনুমতি দেবে না বুমেরাংকে। দেড়শো গজ দূর থেকে তার ব্রিজে লোকজন দেখতে পাচ্ছি আমি। সিডনি শেরিডানের নীল সিল্কের গাউনটা

ফড়িঙের পাখনার মত ঝিকমিক করছে ব্রিজের আলোয়। ধমকের চড়া গলা শুনতে পাচ্ছি তার, কিন্তু কথাগুলো ধরতে পারছি না।

অভিযোগকারীর সাদা লম্বা একটা তর্জনীর মত স্পটলাইটের আলো এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বারবার আগুপিছু যাওয়া আসা করে পানির ওপরটা সার্চ করছে। পরের বার যখন আসবে, আমাকে স্পর্শ করবে আলোটা। পেছন দিয়ে চলে গেল এবার, শেষ প্রান্তে পৌঁছুল, কোন বিরতি না নিয়ে ফিরে আসছে আবার।

এক নিমেষে আমার ওপর এসে পড়ল আলোটা। ঠিক সেই সময় একটা ঢেউ থেকে নেমে গেছি আমি। ঢেউয়ের ফেনা ভেদ করে ল্লান আলো পড়ল আমার গায়ে, কিন্তু থামল না।

দেখতে পায়নি আমাকে ওরা। আরও কিছুক্ষণ নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর সেভার্নের মুখের দিকে ফিরে যাচ্ছে বুমেরাং। লাইফ-জ্যাকেটের কর্কশ আলিঙ্গনের মধ্যে শুয়ে আছি আমি। ক্লান্ত। ঠাণ্ডায় কাঁপছি। মাথার অসাড়াভাবটা এখন নেই, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে হঠাৎ করে-সম্ভবত বিপদ কেটে যাওয়ায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সাইকিক পেইন।

কিন্তু মুক্তি পেয়েছি আমি। এখন শুধু একটাই দুর্ভাবনা-ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে কতক্ষণে মরব।

সাঁতার কাটছি আবার। অনেকক্ষণ হল চোখের আড়ালে চলে গেছে বুমেরাঙের আলো।

ইয়টের ফোকাসলে ফেলে রেখে এসেছি রিস্টওয়াচ, তাই বলতে পারব না কতক্ষণ একনাগাড়ে সাঁতার কাটার পর হাত এবং পাগুলো সম্পূর্ণ অসাড়া হয়ে গেছে আমার। এখনও সাঁতার কাটতে চাইছি আমি, চেষ্টাও করছি, কিন্তু জানি না হাত-পা সাড়া দিচ্ছে কিনা।

নিজেকে ঢিল করে দিয়ে ভেসে থাকার অদ্ভুত একটা অনুভূতি উপভোগ করতে শুরু করেছি। উপকূলের আলোগুলো ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে কখন জানি না একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোমল মেঘ যেন ঘিরে রেখেছে আমাকে। ভাবছি, এটাই যদি মৃত্যুকালীন পরিবেশ হয়, তাহলে এ সম্পর্কে যে আতঙ্ক ছড়ানো হয় তার দেখছি সবটাই পুরোপুরি মিথ্যে। নাক দিয়ে হাসির শব্দ বেরিয়ে এল। শুয়ে আছি অসহায় ভাবে লাইফ-জ্যাকেটে। ভিজছি।

দৃষ্টি শক্তি হারালাম কেন? বারবার বিরক্ত করছে প্রশ্নটা। মৃত্যুর অনেক বিবরণ শুনেছি, কিন্তু কই, অন্ধ হয়ে যাবার কথা তো শুনিনি! তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলাম ভোরের সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছে

কুয়াশার, সেজন্যেই কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি। তবে, ভোরের আলোর তেজ বাড়ছে ক্রমশ। এখন বিশ ফুট দূরে দেখতে পাচ্ছি কুয়াশার নিচ্ছিদ্র, নিরেট প্রাচীর।

চোখ বুজলাম আমি, এবং তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। আমার শেষ চিন্তাটা ছিল, এটাই বোধহয় আমার শেষ চিন্তা। ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসার আগে নিজের হাসির শব্দ শুনছিলাম, মনে পড়ে।

কথাবার্তার আওয়াজে ভেঙে গেল ঘুমটা। চোখ মেলে কুয়াশা ছাড়া কিছুই দেখছি না। অথচ একেবারে কাছ থেকে এবং পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি লোকজনের কণ্ঠস্বর।

চিৎকার করার চেষ্টা করলাম। গলা দিয়ে মৃদু একটু চিঁ চিঁ আওয়াজ বেরুল কি বেরুল না-তাতেই মনে হল, যা হোক, বেঁচে আছি তাহলে। ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠছে লম্বা একটা জেলে নৌকো। দুজন লোক কিনারা থেকে ঝুঁকে পড়ে জাল টানার নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছে।

আবার আমি চাঁচিয়ে উঠলাম। প্রথমবারের চেষ্টায় আওয়াজ বেরোয়নি, কিন্তু মুখের ভেতর থেকে পানিটুকু বেরিয়ে গিয়েছিল। এবার পথ খোলা পেয়ে আওয়াজটা এমন জোরে বেরুল যে চমকে উঠলাম নিজেই, এবং লজ্জা পেলাম।

গুড মর্নিং, ভায়েরা।

জেসাস! একজন জেলে দেখতে পেয়েছে আমাকে। বিস্ময় ধ্বনির সাথে দুই দাঁতের মাঝখান থেকে পাইপটা খসে পড়ল পানিতে, ছাৎ শব্দে নিভে গেল আগুনটা।

নোংরা একটা কঞ্চল মুড়ি দিয়ে খুদে ভূইল হাউজে বসলাম আমি। সস্তা দামের টিনের মগে চিনি ছাড়া গরম চা খাচ্ছি। এত জোরে কাঁপছি যে চা-টুকু আমার দুই হাতে ধরা মগের মধ্যে পাক খাচ্ছে, লাফিয়ে উঠছে অবিরত।

সম্পূর্ণ শরীর নীল হয়ে গেছে আমার। নির্মম ম্যাসেজের ফলে রক্ত চলাচল শুরু হতেই জয়েন্টগুলোয় তীব্র ব্যথা অনুভব করছি। সরল জেলে ওরা, প্রকৃতির সন্তান, ফালতু লাজলজ্জার বালাই নেই-সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে কিছুই ম্যাসেজ করতে বাকি রাখল না আর।

মাছ ধরা শেষ করে ওরা যখন বাড়ি-মুখো হল তখন বিকেল। ইতিমধ্যে আমার পোশাক শুকিয়ে গেছে, পেটে দানাপানি পড়েছে।

পোর্ট ট্যালবটে ভিড়ল নৌকা। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে ওদেরকে পাঁচ পাউণ্ডের নোট তিনটে দিতে গেলাম আমি। বয়স্ক জেলে লোকটা ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সাগর থেকে কাউকে তুলতে পারলেই মনে করি পুরো পারিশ্রমিক পেয়ে গেছি, মিস্টার। টাকা রাখ।

.

বারবার বাস আর ট্রেন বদল করে লগুনে ফেরা দুঃস্থলের মত লাগল। পরদিন সকাল দশটায় ট্রেন থেকে ছিটকে প্যাডিংটন স্টেশনে নামলাম। দুই যুবতী হাসতে হাসতে যাচ্ছে, আমাকে দেখেই আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল দ্রুত। বুঝতে বাকি থাকল না চেহারাটা আমার দেখতে কি রকম হয়েছে।

ট্যাক্সির ড্রাইভার আরও পরিষ্কার ধারণা পেতে সাহায্য করল আমাকে। দুদিনের গজিয়ে ওঠা দাড়ি, ফুলে ওঠা ঠোঁট, লাল চোখ এবং চামড়া ছেলা মুখের ক্ষতগুলোর দিকে তাকিয়ে সবজাত্যের মত মাথা নাড়ল সে। ওর স্বামী বুঝি হঠাৎ এসে পড়েছিল? পালাবার সময় পাওনি? জিজ্ঞেস করল আমাকে। বিড়বিড় করে বললাম, তাকেও আমি ছেড়ে দিইনি।

আঙ্কেল বার্ডের বাড়ির দরজা খুলে দিল রাফেলা। আমাকে দেখে ঢোক গিলল সে। কথা বলতে গিয়ে বিষম খেল। তারপর ক্রমশ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার নীল চোখ।

রানা! ফিসফিস করে বলল ও। রানা, এ কি অবস্থা হয়েছে। তোমার? তু-তুমি...

কেন, পছন্দ হয় না? হাসতে চেষ্টা করলাম আমি। দরজা থেকেই ফিরিয়ে দেবে নাকি?

আমার কাঁধ ধরে টানল রাফেলা। বাড়ির ভেতরে নিয়ে এল আমাকে। পাগল হতে বাকি আছে শুধু। সারাটা দিন! পুলিশে খবর দিয়েছি, সব হাসপাতালে খবর নিয়েছি-সম্ভাব্য সব জায়গায় গেছি নিজে...

পেছনের একটা কামরায় ঘুর ঘুর করছে আঙ্কেল বার্ড, তার উপস্থিতি সাংঘাতিক পীড়া দিচ্ছে আমার স্নায়ুকে। গোসল করে কাপড় বদলাবার রাফেলার প্রস্তাব এক কথায় প্রত্যাখ্যান করলাম আমি। তার পরিবর্তে ওকে নিয়ে পালিয়ে এলাম উইগুসোর আর্মসে।

দাড়ি কামিয়ে বাথরুমের দরজা খোলা রেখেই গোসল করছি, সেই সাথে কথা বলছি আমরা। আমার দৃষ্টিপথ থেকে সরে আড়ালে বসে আছে বটে রাফেলা, কিন্তু বুঝতে পারছি এই অবস্থায় ওর সাথে আলোচনা করার সুযোগটা আমাদেরকে আরও গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে প্রচুর সাহায্য করছে। নিঃশব্দে শুনছে ও, এবং কোন সন্দেহ নেই মুগ্ধ বিস্ময়ই ওর এই মৌনতার একমাত্র কারণ।

কোমরে শুধু তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসলাম আমি। ঘটনার শেষ অংশটা শোনাচ্ছি ওকে, এই ফাঁকে আমার শরীরের কাটাকুটিগুলোর যত্ন নিচ্ছে রাফেলা।

এবার তোমাকে অবশ্যই পুলিশের কাছে যেতে হবে, রানা, অবশেষে মুখ খুলল ও। ব্যাপারটা আর সাধারণ পর্যায়ে নেই। ওরা তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে।

রাফেলা, মাই ডারলিং গার্ল, প্লীজ! পুলিশের নাম উচ্চারণ করে শুধু শুধু আমার হার্টটাকে দুর্বল করে দিয়ো না তুমি।

কিন্তু, রানা...

পুলিসের কথা ভুলে গিয়ে দেখ পার যদি কিছু খাবার আনাও। মনে হচ্ছে জন্মের পর থেকে কিছুই খাইনি আমি।

হোটেলের কিচেন থেকে গ্রিল করা মাংস, টমেটো, ডিম ভাজা, টোস্ট আর চা এল।

মজার কথা, আবার ভয়েরও কথা-কি জানো? খেতে বসে বললাম ওকে। খরচের খাতায় ওরা তোমার নামও টুকে রেখেছে। তোমার হাতে শুধু ফোন্স ফেলতে আসেনি সেদিন ওরা, খুন করতে এসেছিল। সিডনি শেরিডানের ধারণা ওর লোকেরা তোমাকে খুন করে গেছে।

পাথর হয়ে গেল রাফেলা। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে।

তার মানে, বললাম ওকে, ভোরের আলো সম্পর্কে কেউ কিছু জানলেই হল, তারা তাকে খুন করবে।

হুঁ, গম্ভীরভাবে বলল রাফেলা।

যাই হোক, হাতে আমরা বেশ কিছু সময় পাচ্ছি। শেরিডানের বুমেরাং খুবই শক্তিশালী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন, তবু দ্বীপে পৌঁছতে তিন থেকে চার হপ্টা লেগে যাবে তার।

চায়ে সব শেষে দুধ মেশাল রাফেলা, আমি যেভাবে পছন্দ করি। আমার পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে ও, বুঝতে পেরে আরও আশাবাদী হয়ে উঠলাম আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ধন্যবাদ, রাফেলা-তোমাকে দিয়ে আমার চলবে।

ঠোঁট জোড়ার বাইরে জিভের ডগাটা বের করে দেখিয়ে দিল আমাকে ও।

কম করেও লাখখানেক পাউণ্ড খরচ করতে হবে শেরিডানকে এই অভিযানের পেছনে। কি যে আছে ওই পাঁচটা কেসে! কৌশলে তথ্য বের করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হাসল শেরিডান। তার ধারণা আমি জানি।

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাফেলার মুখ। আর যদি কোন দুঃসংবাদ না থাকে, এবার একটা সুসংবাদ শুনবে?

বোধহয় এক-আধটু সহিতে পারব।

চিঠিতে নিরোর নোটটার কথা বলছি-B. Mus।

ব্যাচেলর অভ মিউজিক?

না, ইন্ডিয়ট-ব্রিটিশ মিউজিয়াম।

আরে, তাই তো!

ব্যাপারটা নিয়ে আঙ্কেলের সাথে আলোচনা করছিলাম। সাথে সাথে অথটি ধরতে পেরেছেন। সম্ভবত ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটা বইয়ের রেফারেন্স এটা। আঙ্কেলের রিডার্স কার্ড আছে। একটা বইয়ের জন্যে রিসার্চ করছেন কিনা, প্রায়ই যান ওখানে।

আমরাও যেতে পারব?

যেতেই হবে, বলল রাফেলা।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম।

রিডিংরুমের সোনালি আর নীল গম্বুজের নিচে প্রায় দুঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি। কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি, কোন ধারণাই নেই। নিরোর রেফারেন্স নাম্বারটা দিয়ে একটা ফর্ম পূরণ করেছি শুধু, সেটা জমা দিয়েছি ডেস্কে।

অ্যাটেনড্যান্ট যখন প্রকাণ্ড একটা পাঁচ সের ওজনের বই এনে দিল, ব্যগ্রতার সাথে নিলাম সেটা আমি। সেকার অ্যাণ্ড ওয়ারবার্গ এডিশন এটা, উনিশশো তিপ্পান সালে প্রথম ছাপা হয়েছে। লেখক একজন ডক্টর, পি. এ. রেডি। রেক্সিনের কাভারে সোনালি অক্ষরে নাম লেখাঃ

OF THE WORLD

বইটা খোলার আগে নিরোর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। এই বইটা নাড়াচাড়া করেছে সে, সন্দেহ নেই। কাগজপত্রের এই সব সূত্র অনুসরণ করার পেছনে তার জীবনের অনেক ঘটনাচক্র দায়ী, অনুমান করা যায়। সাগরে হারিয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তুপ এবং গুপ্তধন সম্পর্কে তার প্রচণ্ড কৌতূহলই কি এ-পথে টেনে এনেছিল তাকে? এই বইটা তার হাতে পড়ে আগে, নাকি। পুরানো চিঠিগুলো? এসব প্রশ্নের উত্তর কোনদিন জানতে পারব না আমি।

উনপঞ্চাশটা পরিচ্ছেদে ভাগ করা বইটা। প্রতিটি পরিচ্ছেদ আলাদা বিষয় নিয়ে লেখা। তালিকাটা সাবধানে পড়া শেষ করলাম প্রথমে।

পানামার সোনার তাল এবং পাত, জলদস্যুদের সমগ্র গুপ্তধন, উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালায় হারিয়ে যাওয়া সোনার খনি, দক্ষিণ আমেরিকার একটা ডায়মণ্ড ভর্তি উপত্যকা, আর্মাডার ট্রেনার শিপ, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের স্বর্ণ ভাণ্ডার, আরও ট্রেনার শিপ-আধুনিক এবং প্রাচীন, দুই ধরনেরই-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে পেছনের দিকে ট্রয় নগরী ধ্বংস হওয়ার আগে পর্যন্ত, মুসোলিনীর ধন-সম্পদ-এই রকম অসংখ্য বিষয় রয়েছে। সত্য মিথ্যে, বাস্তব ঘটনা এবং রঙিন কল্পনা, ইতিহাস এবং অনুমান-এই সব মিশিয়ে আশ্চর্য আলাদা একটা জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে বইটিতে। আটলান্টিক থেকে কালাহারি মরুভূমি পর্যন্ত শত শত বছর ধরে কত শহর আর সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেউ আজ আর তার খবর রাখে না, কিন্তু এখানে সেই সব শহর আর সভ্যতার বিপুল ধন সম্পদের সম্ভাব্য বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। যাকে বলে এলাহি কারবার, কোথায় খোঁজ করব আমি সে সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারছি না।

একটা দম নিয়ে সাহসে বুক বাঁধলাম, তারপর সম্পাদকীয় এবং ভূমিকা এড়িয়ে পাঠে মনোনিবেশ করলাম।

পাঁচটার মধ্যে ষোলোটা পরিচ্ছেদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম আর পাঁচটা পরিচ্ছেদ গভীর মনোযোগের সাথে খুঁটিয়ে পড়লাম। কিন্তু ভোরের আলোর সাথে এই সব পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর কোন যোগসূত্র পেলাম না, তবে নিরো কেন হারানো গুপ্তধন সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহী ছিল তা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছি। যে-কোন মানুষকে উত্তেজিত করার মত বিষয় এটা। এটা এমন একটা জগৎ যেখানে একবার চুকলে সহজে বেরুনো যায় না। নিজের অস্তিত্ব ভুলে বুঁদ হয়ে পড়ে যাচ্ছি আমি। আগ্রহে চকচক করেছে আমার চোখ।

নতুন কেনা জাপানী রিস্টওয়াচটা দেখে আঁতকে উঠলাম আমি। বইটা জমা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলাম মিউজিয়াম থেকে। গ্রেট রাসেল স্ট্রীট পেরিয়ে একটা বারে ঢুকলাম, এখানে দেখা করার কথা আমার রাফেলার সাথে।

দুঃখিত, রাফেলার পাশের চেয়ারে বসে বললাম। সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমার একটা হাত চেপে ধরল ও। কি জানতে পেরেছ তাই বল। কৌতূহলে মরে যাচ্ছি আমি।

রাফেলার আকর্ষণ তৃষ্ণা মেটাতে পারলাম না, যা বললাম তাতে ওর চোখ মুখে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কৌতূহলের আগুন। বইটার নাম শুনে আরও অস্থির হয়ে উঠল ও। অর্ডারের খাবার নিয়ে বেয়ারা ফিরে আসার আগেই আমাকে মিউজিয়ামে ফেরত পাঠাতে চাইল। অনেক কাকুতি মিনতি করে কিছুটা সময় চেয়ে নিলাম আমি। কিন্তু খাওয়া শেষ হতে আর একটা মিনিটও বসতে দিল না আমাকে।

উইণ্ডসোর আর্মসে আমার কামরার চাবি দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম ওকে। তারপর দ্রুত আবার ফিরে এলাম মিউজিয়ামের রিডিংরুমে। বইটার পরবর্তী পরিচ্ছেদের নাম-মহান মোঘল সম্রাট এবং ভারতের ব্যাঘ্র সিংহাসন।

পরিচ্ছেদের শুরুতেই একটা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে প্রাচীন দুনিয়ার দুই প্রখ্যাত বীর তৈমুর লং এবং চেন্গিস খান উত্তর-ভারতের পর্বতমালা পেরিয়ে এসে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাথে সাথে অনুধাবন করলাম আমি যে এলাকা সম্পর্কে আগ্রহী এটা তার আওতার মধ্যে পড়তে পারে। প্রাচীন এই উপমহাদেশ থেকেই শেষবারের মত যাত্রা করেছিল ভোরের আলো।

সম্রাট বাবরের পর অন্যান্য মুসলিম শাসকদের গৌরবোজ্জ্বল। ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে প্রথম দিকে। এই সব শাসকরা। ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন এবং দ্রুত ও কৃতিত্বের সাথে উপমহাদেশের চেহারা বদলে দেন। তাঁদের কীর্তির কথা বলে শেষ করা যায় না, যা আজও সারা ভারতে অক্ষয় হয়ে টিকে আছে। এই সব শাসকরা বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং তাঁরা তাজমহলের মত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সবশেষে বর্ণনা করা হয়েছে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন পর্ব। ইংরেজরা দিল্লীর দুর্গ দখল করে নিয়ে মোঘল রাজকুমারদের যাকে যেখানে পেল হত্যা করল, বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহকে বন্দী করল।

এরপর অকস্মাৎ লেখক ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পটভূমি থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ আলাদা এক গল্প ফেঁদে বসেছেন। তা হুবহু এই রকমঃ

ষোলোশো পঁয়ষট্টি খ্রিষ্টাব্দে জিন ব্যাপ্টিস্ট তাভেরনিয়ের নামে এক ফ্রেঞ্চ পর্যটক এবং স্বর্ণকার মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে হাজির হয়েছিল। এর পাঁচ বছর পর প্যারিস থেকে সে ট্রাভেলস ইন দ্য ওরিয়েন্ট নামে একটা বই প্রকাশ করে। মুসলিম শাসকের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয় সে, এবং রাজপ্রাসাদের রত্ন ভাণ্ডারে প্রবেশ করার দুর্লভ অনুমতি পায়। শুধু তাই নয়, উল্লেখযোগ্য কিছু রহস্যের পরিচিতি এবং বর্ণনা লিপিবদ্ধ করারও সুযোগ দেয়া হয় তাকে। এগুলোর মধ্যে একটা ডায়মণ্ড ছিল যেটার নাম দেয় সে-গ্রেট মোঘল। ডায়মণ্ডটা ওজন করে তাভেরনিয়ের, এবং তার ক্যাটালগে দুশো আশি ক্যারেটের কথা লেখে। সে তার বর্ণনায় জানায় অসাধারণ, অত্যাশ্চর্য্য দ্যুতি বিকিরণ করে ডায়মণ্ডটা, এবং এর রঙ এত পরিষ্কার আর সাদা, ঠিক যেন আসমানের গ্রেট নর্থ স্টার।

সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে জানান ষোলোশো পঞ্চাশ সালে গোলকুণ্ডা মাইন থেকে পাথরটা উদ্ধার করা হয় এবং তখন এটার ওজন ছিল সাতশো সাতাশি ক্যারেট।

পাথরটাকে কেটে গোলাকার একটা গোলাপের আকৃতি দেয়া হয়, কিন্তু এর সব দিক সমান ভাগে ভাগ করা নয়, অর্থাৎ কাটিংটা সিমেন্ট্রিক্যাল হয়নি-একটা দিক ফুলে আছে।

পাথরটা সম্পর্কে এর পরে আর কেউ কোন বর্ণনা দিতে পারেনি, তাই অনেকে মনে করে যে তাভেরনিয়ের আলাদা কোন ডায়মণ্ড নয়, আসলে কোহিনুর অথবা অরলফ দেখেছিল। কিন্তু তাভেরনিয়েরের মত একজন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক এবং দক্ষ কারিগর এ-ধরনের স্কুল ভুল করবে তা মোটেও আশা করা যায়। কোহিনুর আর অরলফের সাথে গ্রেট মোঘলের চেহারা, আকৃতি এবং ওজনগত পার্থক্য ব্যাপক, ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না। লগুনে নতুন করে কাটার পর কোহিনুরের ওজন দাঁড়ায় মাত্র একশো একানব্বই ক্যারেট,-বলা বাহুল্য, সেটার আকৃতিও গোলাপের মত নয়। আর অরলফের আকৃতি গোলাপের মত হলেও এটা একটা সিমেন্ট্রিক্যাল পাথর এবং এর ওজন একশো নিরানব্বই ক্যারেট। তাভেরনিয়ের যে পাথরটার কথা বলছে সেটার সাথে এ দুটোর অন্য কোন পাথরের কোন মিল নেই। এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ প্রকাশ একটা স্বতন্ত্র সাদা পাথরের অস্তিত্ব জাহির করছে, যেটা প্রকাশ্যে দুনিয়া থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে।

সতেরশো ঊনচল্লিশ সালে পারস্যের নাদির শাহ ভারতে প্রবেশ করে দিল্লী দখল করেন, কিন্তু ভারতে তিনি স্থায়ী রাজত্ব। কয়েম করতে চাননি, তার পরিবর্তে তিনি বিপুল ধন-রত্ন লুটপাট করে স্বদেশে ফিরে যান-এই সব রত্নের মধ্যে ময়ূর সিংহাসন এবং কোহিনুর ছিল, কিন্তু গ্রেট মোঘল ছিল না। যেভাবেই হোক, গ্রেট মোঘল নাদির শাহের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এরপর ভারত শাসনের দায়িত্ব চাপানো

হয় মোঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহ-এর উপর। ঐতিহাসিক ময়ূর সিংহাসন নেই, তাই মোহাম্মদ শাহ তার বিকল্প একটা সিংহাসন তৈরি করার নির্দেশ দেন।

ময়ূর সিংহাসনের বিকল্প তৈরি হয় বটে কিন্তু নতুন এই মহা। ঐশ্বর্যের অস্তিত্ব সম্ভাব্য সব কৌশলে গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। এর অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থানীয়দের কিছু বক্তব্য পাওয়া গেলেও ইউরোপীয়ানদের মধ্যে মাত্র একজনের বক্তব্য এখানে উল্লেখের দাবি রাখে।

সতেরশো সাতচল্লিশ সালে দিল্লীর দরবারে ইংরেজ দূত ছিলেন স্যার টমাস জেনিং, মোঘল সম্রাটের সাথে তার এক সাক্ষাৎকারের কথা তিনি লিখে রেখে গেছেন ডায়েরীতে। মণিমুক্তোখচিত মহামূল্যবান সিল্কের পোশাক পরে আছেন সম্রাট, বসে আছেন বিশাল এবং সোনার তৈরি সিংহাসনে। ক্রোধোন্মত্ত কর্নেল স্যার রজার গুডচাইল্ড...

একটা বাঘের আকৃতি বিশিষ্ট তার এই সিংহাসন। মুখ হাঁ করে আছে বাঘটা, রাক্ষসের মত একটা মাত্র অত্যুজ্জ্বল চোখ তার কপালে। বাঘের শরীরটা সবরকম দুর্লভ পাথর দিয়ে তৈরি। সিংহাসনের কাছাকাছি গিয়ে বাঘের চোখটা পরীক্ষা করার প্রার্থনা জানাই আমি, মহানুভব সম্রাট আমাকে অনুমতি দিয়ে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এই সময় তিনি আমাকে জানান বাঘের এই চোখটা সর্বকালের একটা বিস্ময়কর ডায়মণ্ড এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে। অনেক হাত ঘুরে এটা তার কাছে এসেছে।

ভারতের ব্যাঘ্র সিংহাসনেই কি তবে তাভেরনিয়েরের গ্রেট মোঘল স্থান লাভ করেছে? তাই যদি হয়, তাহলে এই হারানো ঐশ্বর্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারি আমরা। আশ্চর্য কিছু ঘটনার রোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়ার পর এছাড়া আর কিছু বলার থাকতে পারে না।

আঠারশো সাতান্ন সালের ষোলোই সেপ্টেম্বর দিল্লীর পথে পথে যুদ্ধ বেধে যায়, রাস্তার ওপর আহত এবং মৃত লোকের স্তুপ জমে যায়। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপকতা লাভ করার আগেই বিশ্বস্ত সিপাইদেরকে নিয়ে ব্রিটিশ ফোর্স রাস্তায় নামে, ফলে দুপক্ষের শক্তি একটা ভারসাম্যে স্থির হয়ে থাকে। ব্রিটিশ ফোর্সের তাত্ক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহীদেরকে ঝেটিয়ে শহর থেকে বের করে দিয়ে প্রাচীন দুর্গটা দখল করা-এই দুর্গই ছিল শহরের রক্ষাকবচ।

একশো একতম রেজিমেন্টের দুজন ইংরেজ অফিসারের নেতৃত্বাধীন একদল বিশ্বস্ত সিপাইকে নদী পেরিয়ে প্রাচীর ঘিরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয় উত্তর দিকে রাস্তাটা দখল করার জন্যে। এর উদ্দেশ্য ছিল মোঘল রাজ পরিবারের সদস্য এবং বিদ্রোহী নেতারা বিশ্বস্ত শহর ছেড়ে যেন পালাতে না পারে।

দুজন ইংরেজ অফিসারের নাম ছিল ক্যাপ্টেন ম্যাথু লং এবং কর্নেল স্যার রজার গুডচাইল্ড...

বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে লাফ দিয়ে উঠল দ্বিতীয় অফিসারের নামটা। নামের নিচে পেন্সিলের দাগ এবং মার্জিনে বিস্ময়বোধক চিহ্ন আঁকা রয়েছে। দাগ এবং চিহ্ন টানার ভঙ্গীটাই বলে দিচ্ছে আমাকে, এ কাজ নিরোর। দেখতে পাচ্ছি, হাত দুটো কাঁপছে আমার, উত্তেজনায় গরম লাগছে মুখটা। গোটা ধাধার এটাই শেষ সূত্র, বুঝতে পারছি। শব্দ এবং লাইনগুলোর ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে আমার দৃষ্টি।

আজ আর কেউ বলতে পারবে না ভারতীয় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া সেই নির্জন রাস্তায় সে-রাতে ঠিক কি ঘটেছিল। কিন্তু এর ছয়মাস পর ক্যাপ্টেন লং এবং ভারতীয় সুবেদার রাম পানাত কর্নেল গুডচাইল্ডের কোর্ট মার্শালে সাক্ষী দেবার সময় আশ্চর্য একটা কাহিনী প্রকাশ করে।

শহর দিল্লী তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। পলায়নপর একদল। অভিজাত ভারতীয়কে পথে আটক করে তারা। দলে তিনজন মুসলিম ধর্মীয় নেতা এবং রাজ পরিবারের দুজন কুমার ছিল। ক্যাপ্টেন লং-এর উপস্থিতিতে দুই রাজকুমারের একজন তাদের। জীবন ও মুক্তির বিনিময়ে ব্রিটিশ অফিসারদেরকে পথ দেখিয়ে একটা গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। রাজকুমার জানায়, এক চোখ বিশিষ্ট বাঘ-আকৃতির একটা সোনার সিংহাসন রয়েছে সেখানে।

অফিসাররা রাজি হলে রাজকুমাররা তাদেরকে গভীর জঙ্গলের ভেতর একটা মসজিদে নিয়ে আসে। সেখানে তারা ছয়টা গরুর গাড়ি দেখতে পায়। গাড়িগুলো থেকে খড় দিয়ে ঢাকা জিনিসগুলো নামিয়ে পরীক্ষা করতেই রাজকুমারদের কথার সত্যতা প্রমাণিত। হয়। সোনার সিংহাসনটা খুলে চারভাগে আলাদা করা হয়েছে পেছনের অংশ, ধড়, গলা, এবং মাথা। ল্যাম্পের আলোয় সোনা এবং মহামূল্যবান মণিমুক্তো দিয়ে তৈরি সিংহাসনের অংশগুলো দেখে অফিসাররা স্তম্ভিত হয়ে যায়।

কর্নেল রজার গুডচাইল্ড সেই মুহূর্তে ধর্মীয় নেতা এবং রাজকুমারদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। মসজিদের বাইরের দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো হয় তাদেরকে। সিপাইরা গুলি করার আগে কর্নেল গুডচাইল্ড রাজকুমারদের বিদ্রূপ করার জন্যে কিছুটা সময় ব্যয় করে। তারপর নিহত পাঁচজনের শরীরে সে নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে আরও পাঁচটা গুলি করে, তাদের মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার জন্যে। মসজিদের একটা কুয়ায় ফেলে দেয়া হয় লাশগুলো।

এরপর শহরের প্রাচীর পাহারা দেবার জন্যে বেশির ভাগ সিপাইকে নিয়ে ফিরে আসে ক্যাপ্টেন লং।

ওদিকে পনেরোজন সিপাই এবং সুবেদার রাম পানাতকে নিয়ে কর্নেল গুডচাইল্ড গরুর গাড়ি যোগে রওনা দেয় অন্য দিকে।

ভারতীয় সুবেদার কোর্ট মার্শালকে এরপর আরও বিস্ময়কর এবং নিষ্ঠুর ঘটনার বর্ণনা দেয়।

কর্নেল গুডচাইল্ডের নেতৃত্বে পশ্চিম দিকে রওনা হয় তারা। ব্রিটিশ লাইন পেরিয়ে এসে ছোট একটা গ্রামে তিন দিনের জন্যে ক্যাম্প ফেলে। স্থানীয় কাঠমিস্ত্রী এবং তার দুজন ছেলেকে ডেকে নিয়ে আসা হয়। কর্নেলের নির্দেশে সিংহাসনের চারটে অংশের জন্যে চারটে মজবুত কাঠের বাক্স তৈরি করে তারা। সিংহাসনের সোনার শরীর থেকে মহামূল্যবান পাথরগুলো অত্যন্ত সাবধানে খুলে নেয় কর্নেল, খোলার আগে সে একটা ডায়াগ্রামও তৈরি করে, যাতে আবার সেগুলো সেট করার সময় কোন অসুবিধেতে পড়তে না হয়। পাথরগুলো একটা আয়রন-সেফে রাখা হয়। আয়রন-সেফ সহ কাঠের বাক্স চারটে তোলা হয় গাড়িতে, তারপর এলাহাবাদ রেলস্টেশনের দিকে আবার শুরু হয় যাত্রা।

কর্নেলের হুকুমে কাঠমিস্ত্রী এবং তার দুই ছেলেকেও দলের সাথে রওনা হতে হয়। সুবেদারের মনে পড়ে, রাস্তাটা যখন গভীর জঙ্গলে পৌঁছায়, কাঠমিস্ত্রীদেরকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায় কর্নেল গুডচাইল্ড। একটু পর ছয়টা গুলির শব্দ ভেসে আসে আড়াল থেকে, এবং গাড়ির কাছে ফিরে আসে কর্নেল গুডচাইল্ড একা।

অনেক বছর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে ফুরিয়ে গেছে কর্নেল গুডচাইল্ড, তা নাহলে-পড়া থামিয়ে ভাবছি আমি-হয়ত এই লোকটাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে হত আমাকে। সিডনি শেরিডানের সাথে অনেক মিল লক্ষ্য করছি লোকটার, দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম আমি, তাহলেই শেষ হত আমার দায়িত্ব-এর পরিণতি কি হত, জানা আছে আমার। ধারণাটা হাসির উদ্রেক করল মনে, আবার পড়তে শুরু করলাম।

ছয়দিনের দিন এলাহাবাদে পৌঁছুল কনভয়টা। সৈন্য নিয়ে একটা ট্রেন ফিরছিল বোম্বেতে, সামরিক অগ্রাধিকারের সুযোগ নিয়ে সেই ট্রেনে আয়রন-সেফ এবং বাক্সগুলো তুলে দেয় কর্নেল। ছোট দলটা এরপর ফিরে আসে দিল্লীতে নিজেদের রেজিমেন্টে।

এর ছয় মাস পর ক্যাপ্টেন লং পেটি অফিসার রাম পানাতের সমর্থন নিয়ে কমান্ডিং অফিসার কর্নেল গুডচাইল্ডের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে। আমরা ধরে নিতে পারি কর্নেল ওদেরকে সিংহাসনের ভাগ না দিয়ে সবটুকু একা মেরে দেবার। সিদ্ধান্ত নেয় বলেই থোপে গিয়ে ওই কাণ্ড করে ওরা। কিন্তু তা সে। যাই হোক, এরপর থেকে সেই মহামূল্যবান গুপ্তধনের আর কোন। হৃদিস কোথাও পাওয়া যায়নি।

বোম্বেতে অনুষ্ঠিত বিচার পর্ব ভারত এবং ইংল্যান্ডে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। কিন্তু কর্নেল গুডচাইল্ড সিংহাসনটার অস্তিত্বই অস্বীকার করে। অভিযোগকারীরা প্রমাণ হিসেবে সেটা বিচারকদের সামনে হাজির করতে ব্যর্থ হয়। ফলে বেকসুর। খালাস পেয়ে যায় কর্নেল। তবে এই কলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় চাপের মুখে বাধ্য হয়ে কমিশন থেকে পদত্যাগ করে সে, ফিরে আসে ইংল্যান্ডে। ফেরার সময় সাথে করে ব্যান্স সিংহাসন বা গ্রেট মোঘল ডায়মণ্ড নিয়ে এসেছে সে এর কোন প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। কর্নেলের বাকি জীবন অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে কাটে। কুখ্যাত এক মহিলার সাথে শহরে একটা জুয়ার আড্ডা খোলে সে, এবং সম্ভবত সিফিলিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আঠারশো একাত্তর সালে। তার মৃত্যুর পর পরই অমূল্য সেই ব্যান্স সিংহাসনের প্রসঙ্গটা আবার আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু বাস্তব তথ্যের অভাবে তা আবার চাপা পড়ে যায়। এর রহস্যময় অস্তিত্ব দুচারজন অতি উৎসাহী কল্লনাবিলাসীর মনেই ঠাই পেয়েছে, আর সবাই ভুলে গেছে।

আমরা বোধহয় এই পরিচ্ছেদের নাম, যে গুপ্তধন কখনও ছিল না রাখলে ভাল করতাম।

মোটোও না, সানন্দে ভাবছি আমি গুপ্তধন ছিল-এবং আছে। এরপর আরেকবার প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলাম পরিচ্ছেদটা। এবার রাফেলার কথা ভেবে সাবধানে নোট নিচ্ছি।

.

জানালায় ধারে একটা আরাম কেদারায় বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে রাফেলা। সব বল আমাকে, চাপা স্বরে বলল ও।

বিশ্বাস করবে না তুমি, বললাম আমি।

দশ সেকেন্ড সময় দিলাম, মাসুদ রানা, এর মধ্যে যদি শুরু না কর, নখ দিয়ে আঁচড়ে দুটো চোখই তোমার...।

আমাদের কথা শেষ হতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে মেঝেতে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে ছড়ানো কাগজপত্রের ওপর ভ্রমড়ি খেয়ে পড়েছি আমরা। সেন্ট মেরীর আরকিপেলাগো অ্যাডমিরালটি চার্ট, ভোরের আলোর ড্রয়িং, ফার্স্ট মেট বারলোর বর্ণনা অনুযায়ী আমার তৈরি জাহাজডুবির নকশা এবং নোট, এছাড়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিংরুমে তৈরি করা নোট পরীক্ষা করছি আমরা।

এর মধ্যে দুবার কফি দিয়ে গেছে রুম-সার্ভিস। প্রায়। সারারাত ধরে তর্ক করলাম আর প্ল্যান আঁটলাম আমরা। অসংখ্য প্রশ্ন আমাদের সামনে, এক এক করে সবগুলোর উত্তর বের করার চেষ্টা করছি। ভোরের আলোর খালের কোন অংশে গুডচাইল্ডের পাঁচটা কেস ছিল? রীফ-এর কাছে কিভাবে ভোরের আলো ভাঙে? জাহাজের কোন অংশ ব্রেক-এর ভেতরে ঢোকে আর কোন অংশ। সাগরের দিকে ডুবে যায়?

অনুমানের ওপর নির্ভর করে সম্ভাব্য বারোটা নকশা আঁকলাম আমি। অভিযানের প্রয়োজনে সাজ-সরঞ্জাম যেগুলো না হলেই নয় তার একটা তালিকা তৈরি হয়ে গেল। এ ব্যাপারে সাহায্য করল। রাফেলা আমাকে, এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম যে ও একজন প্রথম শ্রেণীর স্কুবা ডাইভার।

হঠাৎ বুঝলাম, শুধু দর্শক হিসেবে নয়, আমার সঙ্গে এক জন সক্রিয় অভিযাত্রী হিসেবে যাচ্ছে রাফেলা। সে যোগ্যতা পুরোপুরি রয়েছে ওর, এবং প্রচণ্ড কৌতূহল আর আগ্রহেরও কোন অভাব নেই ওর মধ্যে।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে ও, কথা বলার তালে খেয়াল নেই দুজনের মাঝখানের দূরত্বটা বিপজ্জনকভাবে কমে গেছে। মেঝেতে কার্পেটের ওপর ভ্রমড়ি খেয়ে পড়ে আছি আমরা, কাঁধে কাঁধ ঠেকে আছে। আমার দিকে ফিরতে গিয়ে নাকে নাক ঠেকে গেল একবার, দুজন তাকিয়ে থাকলাম দুজনের দিকে।

হঠাৎ সোনার সিংহাসন আর কিংবদন্তীর ডায়মণ্ডের কথা ভুলে গেলাম আমরা। মুহূর্তটাকে চিনতে পারলাম দুজনেই, এবং নির্লজ্জ ব্যগ্রতার সাথে পরস্পরকে পাকড়াও করলাম ওখানেই, ওই মেঝেতেই, ভোরের আলোর নকশার ঠিক ওপরেই। জরুরী ভঙ্গিতে পরস্পরকে নিয়ে মেতে উঠলাম আমরা।

তারপর ওকে তুলে নিয়ে গেলাম বিছানায়। চাদরের নিচে এক হলাম দুজনে। তখনও ফিসফিস করে ওর কানে কথা বলছি আমি। আন্তরিক প্রেম নিবেদনের ভাষা যা হয় সেগুলো নিশ্চয়ই তাই, যে কথা ওর আগে আর কোন মেয়েকে কখনও শোনাইনি আমি।

এবং আমি থামলেই আমার বুকে মুখ ঘষছে রাফেলা, অর্থাৎ আরও শুনতে চাইছে। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে-রাত্রে কথা বলেছিলাম আমি।

এর পরের দুটো দিন গাধার খাটনি খাটলাম আমি। সন্দেহ ছিল সিডনি শেরভার্ডিনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ এতদিন পর জোগাড় করতে পারব কিনা। কিন্তু চরকির মত ঘুরে অসংখ্য জায়গা থেকে পাওয়া টুকরো-টুকরো সূত্রগুলো জোড়া লাগাতেই কংক্রিটের মত শক্ত হয়ে গেল সব।

পাখির পালকের মত হালকা লাগছে নিজেকে, সার্থক হয়েছে আমার ইংল্যান্ডে আসা। মেজর জেনারেল রাহাত খান জিজ্ঞেস করেছিলেন, সিডনি শেরিডানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে তুমি?

হ্যাঁ, এখন পারব আমি।

নয়

আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা মাছের পিঠের মত দেখাচ্ছে সেন্ট মেরী দ্বীপটাকে। গ্র্যাণ্ড হারবারটা যেন শরীরের তুলনায় বড় একটা মুখ, আর চোয়ালের মধ্যে বসানো রয়েছে ছোট্ট শহরটা। গাঢ় সবুজ খেত-খামারের মাঝখানে টিন আর টালির ছাদগুলো আয়নার মত ঝিক ঝিক করে উঠছে। দ্বীপটাকে ঘিরে দুবার চক্কর মারল আমাদের ফকার ফ্রেগুশিপ।

জানালায় কাঁচে মুখ চেপে ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে রাফেলা। উৎসাহ আর উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে ও। আনারসের খেতের কাছে নেমে এল প্লেন, কাজ ছেড়ে মুখ তুলে তাকাচ্ছে দ্বীপবাসিনী মেয়েরা। রানওয়েতে নেমে খুদে এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে থামলাম আমরা, গায়ে মস্ত একটা সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে, তাতে লেখা-সেন্ট মেরী দ্বীপ, ভারত মহাসাগরের মুক্তো। এবং সাইনবোর্ডের ঠিক নিচেই আরও দুটো মহামূল্যবান মুক্তো দাঁড়িয়ে রয়েছে-রডরিক আর ল্যাম্পনি।

রডরিককে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলাম, আমরা আসছি। আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ল্যাম্পনিকে সাথে করে নিয়ে এসেছে ও। দৌড় প্রতিযোগিতায় রডরিককে হারিয়ে দিয়ে ব্যারিয়ারের দিকে ছুটে এল ল্যাম্পনি। ও আমাকে, নাকি আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম-ব্যাপারটা সম্ভবত পরিষ্কার হল না রাফেলার কাছে। ব্যাগগুলো ছিনিয়ে নিল ল্যাম্পনি আমার হাত থেকে। ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম আমি রাফেলা বার্ডের। রাফেলার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ল্যাম্পনি। তার মুগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টির সামনে পড়ে বেশ একটু বিব্রত এবং অপ্রতিভ হয়ে উঠতে দেখছি রাফেলাকে। হঠাৎ সাংঘাতিক ব্যস্ত হয়ে উঠল ল্যাম্পনি। অত্যন্ত তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞার সঙ্গে আমার হাতে ধরিয়ে দিল সে আমার ব্যাগগুলো। তারপর প্রচণ্ড আগ্রহ আর উদ্দীপনার সঙ্গে রাফেলার হাত থেকে তার ব্যাগগুলো কেড়ে নিল। রাফেলার কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে পড়ল সে, পরম। ভক্ত এবং অতি বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের মত অনুসরণ করছে ওকে। ঘাড় ফিরিয়ে যদি একবার তার দিকে তাকাচ্ছে রাফেলা, সেই উজ্জ্বল চকমকে হাসিটা ঝিক করে উঠছে তার মুখে। প্রথম দর্শনেই রাফেলার ভক্ত বনে গেছে সে।

কিন্তু সবটুকু গান্ধীর্ষ আর বিশালত্ব নিয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে রডরিক। ত্রিকালদর্শী প্রাচীন ঋষির মত ভাবলেশহীন, কিন্তু চোহরায় স্থির হয়ে আছে নির্মল পাহাড়ের গা ছমছমে কাঠিন্য। তারপর প্রায় আঁতকে উঠে লক্ষ করলাম ধীরে ধীরে ভাবের বিকাশ ঘটছে তার প্রকাণ্ড মুখে। রাফেলার মনের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে ভেবে বাস্তবিক শঙ্কা বোধ করছি আমি। রডরিকের আকার এবং আয়তনই যে-কোন শহরের মেয়ের জন্যে একটা বিকট দুঃস্বপ্নের মত। তারপর সে যদি সাবধানে নিজের ভাবগুলো লুকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে, যে-কোন মেয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলে তাকে দোষ দেয়া যায় না। কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে উঠল রডরিকের। কপাল এবং মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে উল্টে গেল। মস্ত থাবা দিয়ে

আমার হাতটা ধরল সে, এবং দয়া করে খুব কম চাপ দেয়ায় আমি শুধু অসহ্য ব্যথায় দাঁতে দাঁত চাপলাম, জ্ঞান হারালাম না।

এরপর রাফেলার দিকে তাকাল রডরিক। পরিষ্কার আঁতকে ওঠার শব্দ বেরিয়ে এল রাফেলার গলা থেকে। পরমুহূর্তে যা ঘটল তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অভূতপূর্ব-এর আগে এ-দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। রডরিক তার নোংরা, তোবড়ান সী-ক্যাপটা তুলে ফেলল মাথা থেকে। খয়েরি রঙের মসৃণ গম্বুজটা দেখা যাচ্ছে। তারপর এতবড় করে হাসল, নিচের সারির শেষ প্রান্তের কৃত্রিম দাঁতটার বেগুনি মাড়িটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। প্লেনের হোল্ড থেকে রাফেলার আর আমার আরও লাগেজ এসে পৌঁছুল। ল্যাম্পনিকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল রডরিক, তারপর দুহাতে রাফেলার দুটো ব্যাগ তুলে নিয়ে পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে চলল পিকআপের দিকে। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না ল্যাম্পনি, তার সমস্ত মনোযোগ রাফেলাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে নিবদ্ধ। এদিকে আমার নিজের একগাদা লাগেজের ওজনে নুয়ে পড়েছি আমি, টলতে টলতে কোন রকমে এগিয়ে এসে গাড়ির পেছন দিকে একটু জায়গা করে নিলাম। সান্ত্বনা পাচ্ছি এই ভেবে যে এই প্রথমবার আমার পছন্দ পছন্দ হয়েছে ওদের।

রডরিকের বাড়ির কিচেনে বসেছি আমরা। ব্যানানা কেক আর কফি দিয়ে আমাদেরকে খাতির করল বেগম রডরিক। এর মধ্যে রডরিকের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হলাম আমি। প্রথম দশমিনিট প্রচণ্ড দর কষাকষির মধ্যে কাটল, কিন্তু অবশেষে নতুন মোটর সহ ওর হোয়েল বোটটা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে আমাকে দিতে রাজি হল ও। রাজি হল ওর দাবির চেয়ে তিন গুণ বেশি ভাড়া নিতে। এরই সাথে ঠিক হল, আগের পারিশ্রমিকেই আমার ক্রু হিসেবে কাজ করবে ও এবং ল্যাম্পনি, এবং আমার অভিযান যদি সফল হয়, চার্টারের শেষে, মোটাতাজা একটা বিল ফিশ বোনাসও পাওনা হবে ওদের। আমার অভিযানের উদ্দেশ্য বা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানতে চাইল না ওরা। আমি শুধু ওদেরকে জানালাম দ্বীপমালিকার বাইরের দিকে কোন এক জায়গায় ক্যাম্প ফেলব আমরা, এবং আমি আর রাফেলা কাজ করব পানির নিচে।

প্রস্তুতির কাজে ওদেরকে লাগিয়ে দিয়ে রাফেলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। পাম গাছের ভেতর দিয়ে টার্টল বে-র। দিকে যাবার পথে মা এডির দোকানে একবার থামলাম, নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে নেবার জন্যে।

এটা একটা রূপকথার রাজ্য, চওড়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল রাফেলা। যদিকে তাকাচ্ছে, দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে। পামগাছের ভেতর দিয়ে ধূসর সাগর সৈকত দেখতে পাচ্ছে ও।

ঠিক ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। দুহাতে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলাম। আমার গায়ে হেলান দিল ও, আমার কঙ্জি দুটো ধরে চাপ দিচ্ছে।

বিশ্বাস করো, এতটা সুন্দর, তা কিন্তু ভাবতে পারিনি, আবার বলল ও।

দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটছে ওর মধ্যে, পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি আমি। শীতকালীন লতা যেন ও, দীর্ঘদিন সূর্যের পরশ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তবু আমি অনুভব করেছি নিজের ভেতর কি যেন একটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চেপে রেখেছে ও, অত গভীরে আমি নামতে পারছি না-ফলে একটা অস্বস্তিবোধ খোঁচা মারছে আমাকে সর্বক্ষণ। রাফেলা সাধারণ কোন মেয়ে নয়, তাই সহজে তাকে বোঝাও যাচ্ছে না। কিন্তু এটুকু পরিষ্কার বুঝি, চেপে রাখা বিষয়টা ওকেও অশান্তির মধ্যে ফেলে রেখেছে। আমি ওকে লক্ষ্য করছি না ভেবে কয়েকবারই গভীর মনোযোগ আর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছে ও, কিন্তু ব্যাপারটা প্রতিবার ধরে ফেলেছি আমি। তারপর সরাসরি চোখাচোখি হতেই সতর্ক হয়ে উঠেছে ও, চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে অপ্রতিভভাবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন সময়ের মধ্যেই আমার প্রতি একটু যেন বিকল্প ভাবের প্রতিচ্ছায়া ওর চোখে দেখতে ভুল করিনি আমি। আমার মনে হয়েছে, যে-কোন কারণেই হোক, সম্ভবত ঘৃণা করে ও আমাকে।

এসব ঘটেছে দ্বীপে আসার আগেই। কিন্তু এখন আমি ওর পরিবর্তনটা স্পষ্ট ধরতে পারছি। দীর্ঘদিন পর সূর্যের উষ্ণ পরশ পেয়ে লকলকিয়ে উঠেছে শীতকালীন লতা।

পা ছুঁড়ে জুতো জোড়া খুলে ফেলল ও, আমার বাহুর ঘরের মধ্যে শরীরটা ঘুরিয়ে নিল, তারপর পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু হল। আমাকে চুমো খাবার জন্যে।

ধন্যবাদ, রানা। এখানে আমাকে নিয়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ, আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সুর বাজল আমার কানে।

আমার অনুপস্থিতিতে রোজ একবার করে এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে রেখে গেছে বেগম রডরিক। রেফ্রিজারেটরটা চালু অবস্থায় পেলাম, ফুলদানিতে তাজা ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। হাত ধরাধরি করে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছি আমরা। কিছু ফার্নিচার সত্যি মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করল রাফেলার, কিন্তু বাকি সব বাতিলযোগ্য ঘোষণা করে জানাল নতুন ফার্নিচারের অর্ডার দেবার সময় তার সঙ্গে আমি না গেলেও চলবে। ফুলদানির ফুলগুলোর প্রশংসা করল ও, কিন্তু সেগুলো নতুন করে সাজাতে দশটা মিনিট ব্যয় করল। এক ঘন্টার মধ্যেই গোটা বাড়ির চেহারা নতুন এবং নিজস্ব রুচির ছাপ রাখতে সমর্থ হল ও।

বড় বেডরুমে ঢুকে পোশাক পাল্টে সুইমসুট পরলাম আমরা। রাফেলা আমার প্রেমে আক্রান্ত হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আবিষ্কার করেছি নিজের শরীরটাকে যথাসম্ভব ঢেকে রাখার ব্যাপারে সাংঘাতিক সতর্ক ও, দিগম্বর সেজে সাগরে যাওয়ার আমার প্রস্তাবের কপালে ওর মুখভেঙচানি ছাড়া কিছুই জুটল না। সুন্দরী এবং ভালবাসি এমন একটা মেয়ের সান্নিধ্য পেতে হলে কিছু ত্যাগ তো স্বীকার করতেই হবে, তাই নিয়ম এবং অভ্যাস ভেঙে সুইমসুটটা পরতেই হল আমাদের। রাফেলা বিকিনি পরল। এই প্রথম ওকে সবচেয়ে খোলা অবস্থায় দেখার সুযোগ পাচ্ছি আমি। মুগ্ধ হয়ে আবিষ্কার করলাম একা ওর গায়ের রঙটাই যেকোন চক্ষুস্থান পুরুষকে পাগল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। তরল। সোনার সঙ্গে মধু মেশালে এ রঙ আসে কিছুটা। বেশ লম্বা রাফেলা, কাঁধ দুটো একটু বেশি চওড়া, কিন্তু নিতম্বটা যেন একেবারে নিখুঁত মাপ নিয়ে গড়া। কোমরটা সরু, সমতল তলপেট, নাভিটা গভীর।

ওটার দিকে তাকিয়ে আছি, কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ করল না। ও। দাদী আম্মা গো!-ছোকরার চোখ দুটো কত বড় দেখে না! অভিযোগের সুরে বলল ও, তারপর তোয়ালেটা সারঙের মত কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে ঢেকে ফেলল নাভিটা। তবে খালি পায়ে বালির ওপর দিয়ে যখন হাঁটতে শুরু করল তখন ওর মধ্যে কোন রকম জড়তা বা সঙ্কোচ দেখছি না। ঘাড় ফিরিয়ে ওর বুক এবং নিতম্বের দোল দোল দুলুনি দেখছি লক্ষ করেও মুখ ভেংচাল না।

পানির নাগাল থেকে অনেক দূরে তোয়ালে খুলে রেখে শক্ত আর ভিজে বালির ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছি আমরা স্বচ্ছ, উষ্ণ পানির দিকে। ধীর এবং সাবলীল ভঙ্গিতে দ্রুত সাঁতার কাটার অদ্ভুত গুণ রয়েছে ওর মধ্যে, বারবার আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে ও, প্রতিবার প্রচুর খেটে ধরার চেষ্টা করছি ওকে।

রীফ ছাড়িয়ে এসে পানির ওপর একই জায়গায় ভেসে রয়েছে আমরা। অনেকদিন অভ্যাস করি না কিনা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও।

খানিক বিশ্রাম নেবার পর উন্মুক্ত সাগরের দিকে তাকিয়েছি, সেই মুহূর্তে পানির গা ছুঁড়ে কালো ফিন-এর একটা রেখা জেগে উঠল। পনেরো বিশ হাত ব্যবধান রেখে একটা করে ফিন, সংখ্যায় পনেরো বিশটা, একই সরলরেখায় থেকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। পুলকের ঢেউ জাগল আমার শরীরে। আনন্দ চেপে রাখতে পারলাম না।

তুমি ওদের সম্মানিত অতিথি, রাফেলাকে বললাম, এটা একটা বিশেষ অভ্যর্থনা।

উত্তেজিত একদল কুকুর ছানার মত আমাদেরকে ঘিরে চক্কর মারছে ডলফিনগুলো, কাছে এসে ডিগবাজি খেয়ে পালাচ্ছে, রাফেলাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করার ফাঁকে তীক্ষ্ণ গলায় চঁচামেচি করছে

নিজেদের মধ্যে। এর আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানি আমি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগন্তুক দেখামাত্র গোমড়া মুখ নিয়ে দ্রুত ফিরে যায় ওরা। প্রথমবারের সাক্ষাতে গা ছোঁয়ার কোন সুযোগ কখনও কাউকে ওরা দিয়েছে বলেও জানা নেই আমার। অনেক দিনের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার পরও তত কাছে আসে না ওরা, অনেক অনুরোধ এবং প্রেম নিবেদন করলে তবে হয়ত মন গলে ওদের। যাই হোক, রাফেলার বেলায় দেখছি প্রথম দর্শনেই প্রেমরডরিক আর ল্যাম্পনির মতই ওর পরম ভক্ত হয়ে উঠেছে ওরা।

পনেরো মিনিটও কাটল না, ওকে নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল ডলফিনদের মধ্যে। একটার পিঠ থেকে খসে পড়া মাত্র বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে নাক দিয়ে তুলে নিচ্ছে ওকে আরেকটা। ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে।

একটা ডলফিন রাফেলাকে নিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে, এদিকে অন্যান্যরা নাক দিয়ে গুতো মারছে আমাকে, চাইছে আমিও ওদের পিঠে চেপে রাফেলাকে অনুসরণ করি। কিন্তু একবার সম্মতি দিলে সহজে এই খেলা থেকে সরিয়ে আনা যাবে না ওদেরকে, তাই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম আমি। নিরাশ হয়ে আমাকে ছেড়ে দল বেঁধে চলে গেল ওরা। বিশ মিনিট পর দিগন্তরেখার কাছে দেখতে। পেলাম আবার ওদেরকে, রাফেলাকে পেছনে নিয়ে তীরবেগে। এগিয়ে আসছে গোটা দলটা সরল একটা লাইন বেঁধে।

আরও কাছে আসতে ভুলটা ভাঙল আমার। ভেবেছিলাম ভয়ে বুঝি আধমরা হয়ে গেছে রাফেলা। কিন্তু তা নয়। আনন্দে এবং উত্তেজনায় চিকচিক করছে ওর চোখ, মুক্তোর মত দাঁত দেখা যাচ্ছে, পানির ঝাপটা লাগলেই মাথা ঝাঁকাচ্ছে দ্রুত এবং ঘনঘন হাসছে।

কাছে এসে পড়ল ওরা। কিন্তু তখনই আমার হাতে ফিরিয়ে দিল না ওরা রাফেলাকে। রাফেলার ওপর ওদেরও যেন সম্পূর্ণ অধিকার আছে, নিজেদের খুশি মত যতক্ষণ পারে ওকে নিয়ে খেলা করতে চায়।

এর কিছুক্ষণ পর ওরা বোধহয় বুঝতে পারল আমরা ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। সানন্দে ফিরে আসতে দিল আমাদেরকে তীরের দিকে। কিন্তু একটা প্রকাণ্ডদেহী বুল ডলফিন রাফেলার পিছু ছাড়ল না। অনুসরণ করে অগভীর পানিতে চলে এল সে। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে রাফেলা, বুল ডলফিন উল্টে গিয়ে চিৎ হয়ে আছে। রাফেলা কর্কশ একমুঠো সাদা বালি ঘষছে তার তলপেটে, আর নির্বোধ নিঃশব্দ ডলফিন-হাসিটা স্থির হয়ে আছে তার মুখে।

সন্ধ্যার পর, যখন আমরা বারান্দায় বসে ভুইঙ্গির গ্লাসে চুমুক। দিচ্ছি, তখনও শুনতে পাচ্ছি বুল ডলফিন লেজ দিয়ে বাড়ি মারছে পানিতে, শিস দিচ্ছে-বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে সেই থেকে ডাকছে ও রাফেলাকে।

পরদিন সকালে কাজে হাত দিলাম আমরা।

জলকুমারী থেকে উদ্ধার করা সাজ-সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা শেষ করে একমুঠো টাকা নিয়ে কমপ্রেসারের জন্যে একটা ইঞ্জিন কিনতে চলে গেল রডরিক। মোটর নিয়ে ফিরল ও, জানাল, কিছু মেরামত দরকার হবে ওটার। প্রায় সারাদিনের কাজ পেয়ে গেলাম আমি। ক্যাম্পিং সরঞ্জাম আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করতে পাঠিয়ে দিলাম রাফেলাকে মা এডির দোকানে। রডরিকের সাথে আলোচনা করে তিন দিন পর রওনা হবার প্ল্যান করেছি আমরা। হাতে এত বেশি কাজ, তিনটে দিন কিভাবে কেটে গেল টেরই পেলাম না আমরা কেউ।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, বোটে যে যার জায়গায় উঠে বসলাম আমরা। স্টার্নের দিকে মোটরের কাছে রডরিক আর ল্যাম্পনি, আর দাঁড়ে বসা জোড়া পাখির মত মালপত্রের বোঝার ওপর আমি ও রাফেলা।

কালো ঘোমটা খুলে গরম লাল লোহার মত বেরিয়ে এল ভোর। লক্ষণ দেখে বোঝা গেল দিনটা হবে আগুন ঝরা। দক্ষিণ মুখো এমন একটা কোর্স ধরেছে রডরিক যদিকে ছোট একটা বোট নিয়ে দক্ষ এবং অসমসাহসী একজন স্কিপারই শুধু যেতে পারে। খুদে, ছড়ানো ছিটানো দ্বীপমালিকা আর প্রবাল প্রাচীরের গা ঘেঁষে ছুটছি আমরা, কখনও আমাদের কীল আর ছড়ানো প্রবাল কণার মাঝখানে মাত্র আঠারো ইঞ্চি পানি দেখতে পাচ্ছি।

আশ্চর্য উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে আমাদের সবার মধ্যে। অগাধ ধন-সম্পদ উদ্ধার করার আশায় উত্তেজিত হয়ে আছি, ব্যাপারটা ঠিক তাও নয়। এখনও আমার একমাত্র চিন্তা জলকুমারীর মত একটা বোট পেলে আর কিছু চাওয়ার নেই আমার। সব সম্পদের সেরা সম্পদ, দুর্লভ একটা রত্ন বলতে এখনও আমি জলকুমারীর মত একটা বোটকেই বুঝি। সাগর থেকে যদি কিছু তুলে এনে ওরকম একটা বোট ফিরে পেতে পারি, সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

সাগর থেকে উঠে এল উত্তপ্ত সূর্য। কঠিন, নীল, বিশাল আকাশ জ্বলছে মাথার ওপর। বো-তে দাঁড়িয়ে জ্যাকেট আর জিনস খুলছে রাফেলা, নিচে পরে আছে বিকিনিটা। পোশাকগুলো খুলে ভাঁজ করে রেখে দিল ব্যাগে। সান লোশনের একটা টিউব বের করে সোনালি মখমলের মত চামড়ায় সেটা মাখাচ্ছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল রডরিক আর ল্যাম্পনি। সাধারণ ভদ্রতা জলাঞ্জলি দিয়ে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওরা। আলোচ্য বিষয়ে দুজনেই যে ঐকমত্য পোষণ করে তা ওদেরকে প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়তে দেখেই বুঝতে পারলাম। একটু পরই একটা ক্যানভাসের টুকরো দিয়ে ল্যাম্পনিকে পাঠাল রডরিক। রাফেলার গায়ে যাতে রোদ না লাগে তার জন্যে ক্যানভাস টাঙিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে চায় সে। কাজটা ল্যাম্পনি শুরু করতেই বাধা দিল রাফেলা, সাথে সাথে দুজনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে গেল।

হাত ছুঁড়ে প্রতিবাদ করল ল্যাম্পনি। রোদ লাগলে আপনার সোনার চামড়া জ্বলে যাবে, মিস রাফেলা!

কিন্তু সুবিধে করতে পারল না ওরা, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হল ল্যাম্পনিকে। রাফেলা হেসে উড়িয়ে দিল ওর কথা।

প্রচণ্ড শোকে মিয়মান দুই এতিমের মত বসে থাকল ওরা। প্রকাণ্ড মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে উল্টে গিয়ে বুলডগের মত চেহারা হয়েছে রডরিকের, আর নার্সাস ভঙ্গিতে দ্রুত হাত কচলাচ্ছে। ল্যাম্পনি, দুশ্চিন্তায় আরও কালো হয়ে গেছে তার মুখ।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সহ্য করতে না পেরে আবার ওরা গোপন পরামর্শ শুরু করল, এবং আবার প্রতিনিধি করে পাঠানো হল ল্যাম্পনিকে। এবার সমর্থন আদায় করার জন্যে আমার কাছে।

মিস রাফেলাকে এ-কাজে বাধা দাও তুমি, মিস্টার রানা, রাফেলা দ্বীপে আসার পর থেকে আমাকে সম্বোধন করার রীতি বদলে নিয়েছে ল্যাম্পনি। এভাবে গায়ে রোদ লাগালে কালো হয়ে যাবেন উনি।

ঠিক তাই হতে চাইছে ও, ল্যাম্পনি, বললাম ওকে। তবে দুপুরের কড়া রোদের ব্যাপারে সাবধান করে দিলাম রাফেলাকে আমি। দুপুর বেলা যখন খাবার সময় হল তখন একটা বালুকাবেলায় নামলাম আমরা, তার আগে বাধ্য মেয়ের মত নিজেকে ঢেকে নিল রাফেলা।

বিকেলের দিকে ওল্ড মেন-এর চুড়া তিনটে দেখতে পেলাম আমরা, সবিস্ময়ে বলল রাফেলা, কি আশ্চর্য! ফাস্ট মেট বারলোর বর্ণনার সাথে ভুবভূ মিলে যাচ্ছে, রানা!

সাগরের দিক থেকে এগোচ্ছি আমরা দ্বীপটার দিকে, দ্বীপ আর রীফ-এর মাঝখানে শান্ত পানির সরু বিস্তৃতি ধরে। জিনবালা ক্রাশবোটকে ফাঁকি দেবার জন্যে যে প্রবেশ মুখের ভেতর দিয়ে জলকুমারীকে নিয়ে চ্যানেলে ঢুকেছিলাম সেটার পাশ দিয়ে যাবার সময় রডরিক আর আমি নিঃশব্দে হাসলাম।

সেদিকটা দেখিয়ে বললাম রাফেলাকে, মেইন ক্যাম্প দ্বীপে ফেলব বলে ঠিক করেছি, আর জাহাজডুবির জায়গায় ফেরার জন্যে ওই গ্যাপটা ব্যবহার করব।

সরু চ্যানেলটার দিকে গভীরভাবে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রাফেলা, তারপর বলল, বেশ একটু ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘুর পথে যেতে হলে রোজ প্রায় বিশ মাইল পাড়ি দিতে হবে। তাছাড়া, দেখে যতটা ভয় লাগছে আসলে তত বিপজ্জনক নয় ওটা। একবার আমি আমার পঞ্চাশ ফুট বোটকে ওটার ভেতর দিয়ে ফুল স্পীডে নিয়ে গেছি।

তুমি পাগল নাকি? নাক থেকে চশমাটা মাথায় তুলে আমার দিকে তাকাল রাফেলা।

তা তুমিই ভাল বলতে পারবে, নিঃশব্দে হাসলাম আমি।

তা যা বলেছ, নিঃশব্দ হাসিটা ফিরিয়ে দিল ও। তোমার সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠছি আমি।

ওর নাক, কপাল আর গালের দুদিক ঝলমল করছে। রোদ লেগে চামড়া পুড়ে বা ঝলসে না গিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ভরা জোয়ারের সময় দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে সুরক্ষিত একটা ছোট্ট বে-তে পৌঁছুলাম আমরা। বালুকাবেলার যেখানটায় বোট থামাল রডরিক সেখান থেকে প্রথম সারির নারকেলগাছগুলো মাত্র বিশ ফুট দূরে।

কার্গো নামিয়ে নারকেলগাছের ভেতর দিয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে পানির সম্ভাব্য ছোঁয়ার বাইরে রাখলাম সেগুলো, তারপর গুঁড়ো লবণ বাতাসে উড়ে এসে পড়ার ভয়ে ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে দিলাম সব। ইতিমধ্যে উত্তাপ কমে গেছে রোদের। নারকেলগাছের লম্বা ছায়া মাড়িয়ে দ্বীপের ভেতর দিকে চলেছি আমরা, সাথে পাঁচ গ্যালন বিশুদ্ধ পানির কনটেইনার আর যে-যার ব্যক্তিগত জিনিস ছাড়া কিছুই নিইনি। সর্বদক্ষিণ প্রান্তের চূড়াটার পেছনে, খাড়া ঢালের গায়ে যুগ যুগ ধরে গভীর গুহা তৈরি করেছে। জেলে সম্প্রদায়। মালপত্র রাখার জন্যে বড় একটা গুহা বেছে নিলাম আমি। অপেক্ষাকৃত ছোট একটা নির্বাচন করল রাফেলা, সেটায় ও আর আমি থাকব। ঢালের কিনারা ঘেঁষে প্রায় একশো গজ এগিয়ে গিয়ে আরেকটা গুহা দখল করল নিজেদের জন্যে রডরিক আর ল্যাম্পনি, মাঝখানে আমাদেরকে আড়াল করে রেখেছে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের একটা পাঁচিল।

নারকেলের পাতা দিয়ে একটা ঝাটা তৈরি করল রাফেলা। নতুন ঘরটা পরিষ্কার করে পাশাপাশি রাখল স্লিপিং ব্যাগ দুটো। মুচকি হেসে ঝাঁকি জালটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লাম আমি, ফিরে যাচ্ছি ছোট বে-র দিকে।

সন্ধ্যার পর এক ডজন মুলিট নিয়ে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে ল্যাম্পনি আগুন জ্বলে তাতে কেটলি বসিয়ে দিয়েছে। নিঃশব্দে খেয়ে উঠলাম আমরা।

নিজেদের গুহায় পাশাপাশি শুয়ে আমি আর রাফেলা, কান পেতে শুনছি নারকেলগাছের ভেতর কাঁকড়াদের হাঁটাচলার শব্দ।

পরিবেশটা, জানো, আশ্চর্য আদিম লাগছে আমার কাছে, ফিসফিস করে একসময় বলল রাফেলা। আমরা যেন পৃথিবীর প্রথম পুরুষ আর নারী।

কথাটা স্বীকার করে নিতেই আমার আরও কাছে চলে এল ও।

দশ

পরদিন ভোরবেলা হোয়েলবোট নিয়ে একা রওনা হয়ে গেল রডরিক। সেন্ট মেরী দ্বীপে যাচ্ছে, হপ্টা দুয়েকের ব্যবহারের জন্যে যথেষ্ট পেট্রল আর পানি নিয়ে আগামীকাল ফিরে আসবে ও।

ওর অপেক্ষায় থাকার সময় আমি আর ল্যাম্পনি তীরের কাছ থেকে সরঞ্জাম আর রসদ গুহায় বয়ে নিয়ে আসার কঠিন কাজটা সেরে ফেললাম। কমপ্রেসারটা সেট করে খালি এয়ার বটল দুটো চার্জ করে নিলাম, পরীক্ষা করলাম ডাইভিং গিয়ার। ওদিকে আমাদের কাপড় ঝুলিয়ে রাখার জন্যে দড়ি টাঙানো থেকে শুরু করে জুতো রাখার জায়গা নির্বাচন পর্যন্ত ঘর-দোরের হাজারটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকল রাফেলা, নিজেকে দম ফেলার ফুরসত দিচ্ছে না।

পরদিন ওকে নিয়ে দ্বীপটা ঘুরে ফিরে দেখার জন্যে বেরলাম আমি। চূড়া, উপত্যকা এবং সৈকতে টুঁ মারলাম বিশুদ্ধ পানির সন্ধানে। একটা ঝর্ণা বা একটা কুয়া পাওয়া যেতে পারে, যা জেলেদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু পেলাম না আমরা। বুঝলাম, বুড়ো জেলেদের চোখকে কিছুই ফাঁকি দিতে পারে না।

দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তটা আমাদের ক্যাম্প থেকে সবচেয়ে দূরে। চূড়া আর সাগরের মাঝখানে বিশাল এলাকাটা কাদাময় আর জলমগ্ন, তাতে ঘন আর লম্বা ঘাস জন্মেছে। মরা মাছ আর পচা ঘাসের দুর্গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। কাদার গায়ে হাজার হাজার গর্ত দেখা যাচ্ছে, গর্তের বাইরে মুখ বের করে বসে লাল কাঁকড়াগুলো। ম্যানগ্রোভে হীরণ পাখিরা বাচ্চা ফোটাচ্ছে। একটু গভীর পানিতে ঝপাৎ করে কি যেন পড়ল, ঘাড় ফেরাতেই সাঁাত করে ডুবে যেতে দেখলাম একটা কুমীরের লেজ। এলাকাটাকে পাশ কাটিয়ে আরও উঁচুতে উঠে এলাম আমরা, তারপর ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে সর্ব দক্ষিণ প্রান্তের চূড়াটার দিকে এগোলাম।

রাফেলার সিদ্ধান্ত, এই চূড়াটাতে অবশ্যই উঠতে হবে আমাদেরকে। এটা সবচেয়ে লম্বা আর খাড়া, এই যুক্তি দেখিয়ে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করলাম ওকে। কোন গুরুত্বই দিল না কথাটায়।

চূড়ার দক্ষিণ প্রাচীরের নিচে সরু একটা কার্নিস দেখতে পেয়ে সেটা ধরে উঠছি আমরা। সাংঘাতিক বিপজ্জনক পথ এটা, প্রস্তুতি নিয়ে এখানে ওঠার মত বোকামি আর কিছু হতে পারে না, কিন্তু ভূতে ধরেছে রাফেলাকে, আমার সমস্ত কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে তবু এগিয়ে যাচ্ছে ও। একান্ত বাধ্য হয়েই অনুসরণ করে যাচ্ছি ওকে আমি।

ভোরের আলোর মেট বারলো যদি একেবারে চুড়ায় উঠতে পারে, আমিও তাহলে পারব, ঘোষণা করল ও।

আর সব চুড়া থেকে যা দেখেছ এটার মাথা থেকেও তাই। দেখা যাবে-সুতরাং কষ্ট করে লাভ কি?

সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়।

বিবেচ্য বিষয় তাহলে কোনটা? জানতে চাইলাম আমি।

নিঃশব্দে করুণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল রাফেলা, কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

কার্নিসের কিনারা থেকে ঝপ করে খাড়া দুশো ফিট নেমে গেছে পাহাড়ের গা, নিচে ঢালটা দেখা যাচ্ছে। ক্রুক্ষেপ না করে নির্বিকার এগোচ্ছে রাফেলা। ভাগ্য ভাল যে কার্নিসটা ক্রমশ আরও সরু হয়ে যায়নি। ওর কাছ থেকে হাত দশেক পিছিয়ে পড়েছি, হঠাৎ উল্লাসে চাঁচিয়ে উঠল ও, তারপর কার্নিসের একটা বাক পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এক নিমেষে।

বাঁকটা আমিও পেরোলাম, দেখি, পাহাড়ের খাড়া শরীর লম্বালম্বিভাবে চিরে দুভাগ করে দিয়েছে একটা ফাটল, তার ভেতর দিয়ে সিড়ির ধাপের মত উঠে গেছে একটা প্যাসেজ, একেবারে সেই চুড়া পর্যন্ত। প্যাসেজটা প্রকৃতির তৈরি একটা চিমনির মত। রাফেলাকে অনুসরণ করে সেটার ভেতর ঢুকে স্বস্তিবোধ করলাম আমি। প্রায় সাথে সাথে চাঁচিয়ে উঠল ও।

ও ডিয়ার গড! রানা, দেখ! একদিকের দেয়ালের গায়ে অগভীর একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, সেদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে রাফেলা। ওর পাশে এসে দাঁড়লাম আমি।

গর্তের পেছন দিকের সমতল দেয়ালে বহু যুগ আগে কেউ একজন অত্যন্ত ধৈর্য ধরে কয়েকটা অক্ষর খোদাই করেছিল, আজও তা অল্গান হয়ে আছে। লেখাটা পড়তে শুরু করতেই হাঁত করে উঠল বুক।

এ.			বারলো
এই	জায়গায়	সর্বস্বান্ত	হয়েছিল
১৪ অক্টোবর, আঠারশো সাতান্ন সাল			

লেখাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমরা, অনুভব করছি ওর হাতটা হাতড়ে খুঁজে নিল আমার একটা হাত, সেটা চেপে ধরে অভয় পেতে চাইছে ও। ভয়ে শুকিয়ে গেছে ওর মুখ।

গা হুমহুম করছে আমার, ফিসফিস করে বলল ও। ভৌতিক, তাই না? মনে হচ্ছে গতকাল কেউ লিখে রেখে গেছে—এত বছরের পুরানো বলে ভাবতে পারছ?

মিথ্যে বলেনি রাফেলা, ঝড়-বৃষ্টি আর রোদের মুখ দেখেনি। বলে লেখাগুলোকে সদ্য পাথর কেটে তৈরি করা বলে মনে হচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে তাকালাম আমি, যেন বুড়ো বারলো কোথাও থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কিনা পরীক্ষা করলাম।

ধাপ বেয়ে চিমনির ভেতর দিয়ে অবশেষে চুড়ায় উঠে এলাম। আমরা। কিন্তু এখনও বারলোর সেই কবেকার রেখে যাওয়া বার্তাটা স্রিয়মান করে রেখেছে আমাদেরকে। ওখানে দুঘন্টা বসে। গানফায়ার রীফ-এর গায়ে সাদা একটা রেখায় আছাড় খেয়ে ঢেউগুলোকে ভেঙে পড়তে দেখছি। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখতে। পাচ্ছি রীফ-এর গ্যাপ এবং ব্রেক-এর বিশাল কালো পুলটা। কিন্তু প্রবালের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া সরু চ্যানেলটার অস্তিত্ব অস্পষ্ট ভাবে কোনরকম টের পাচ্ছি। ঠিক এই জায়গা থেকে আর্থার বারলো ভোরের আলোকে ডুবে যেতে দেখেছিল, একের পর এক উঁচু ঢেউ এসে জাহাজটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, রাফেলা, ওকে বললাম আমি। সিডনি শেরিডান বুমেরাং নিয়ে বেরিয়েছে আজ চৌদ্দ দিন। কেপটাউন থেকে খুব বেশি দূরে নেই এখন। অবশ্য ওখানে সে পৌঁছুলেই জানতে পারব আমরা।

কিভাবে?

আমার এক পুরানো বন্ধু আছে ওখানে, ইয়ট ক্লাবের মেম্বর। ট্রাফিকের দিকে নজর রাখছে সে। বুমেরাংকে ভিড়তে দেখলেই জানাবে আমাকে।

চুড়ার পেছন দিকের ঢাল বেয়ে নেমে গেল আমার দৃষ্টি, এই প্রথম নারকেলগাছের মাথার ওপর নীলচে ধোঁয়া উড়তে দেখলাম। বুঝলাম, রান্নার কাজে আগুন ধরিয়েছে ল্যাম্পনি।

এখন থেকে সাবধানে চলতে হবে আমাদেরকে, বললাম আবার। এ পর্যন্ত পিকনিকে বেরুনো একদল স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর মত আচরণ করেছি আমরা। কিন্তু সময় হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রাখার জন্যে সবারকম সতর্কতা অবলম্বন করার। চ্যানেলের ওপারেই জিনবালা ক্রাশবোর্টে রয়েছে আমার প্রাণের বন্ধু হুমাযুন দাদা-আমি জানি, মাথার চারপাশে আট জোড়া চোখ লাগিয়ে খুঁজছে সে আমাকে। এবং যখন এলে আমি খুশি হব তারচেয়ে অনেক আগেই এদিকের পানিতে পৌঁছে যাবে বুমেরাং। এখন থেকে সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে।

কাজটা শেষ করতে কতটা সময় লাগবে আমাদের?

তা যদি জানতাম! চিন্তিতভাবে বললাম আমি। সেন্ট মেরী থেকে পেট্রল আর পানি আনতেই প্রচুর সময় বেরিয়ে যাবে। প্রতি জোয়ারের সময় মাত্র কয়েক ঘন্টা কাজ করতে পারব আমরা পুলে, যখন আবহাওয়া এবং পানির উচ্চতা অনুকূল বলে মনে হবে। কাজ শুরু করার পর কে জানে ওখান থেকে কি পাব আমরা। শেষ পর্যন্ত আমরা হয়ত আবিষ্কার করব গুডচাইল্ডের পার্সেল ভোরের আলোর পেছনের হোল্ডে ছিল, এবং জাহাজের সে-অংশটা খোলা সাগরের দিকে পড়েছে। তা যদি হয়, ওটার আশা ছেড়ে দিয়ে সসম্মানে নিজেদেরকে পরাজিত ধরে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এ বিষয়ে বিস্তর তর্ক এর আগে করেছি আমরা, রানা, দ্য গ্রেট নৈরাশ্যবাদী, বলল রাফেলা। তার চেয়ে এসো, কিছু মজার বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যাক।

প্রস্তাবটা লুফে নিলাম আমি, এবং সাথে সাথে জানতে চাইলাম, জলদি বল! কটা ছেলে, কটা মেয়ে চাই? কার কি নাম রাখবে? তাদেরকে কোথায় রেখে মানুষ করবে? কাকে কি পড়াবে?

এটা দেখছ? মুঠো পাকানো হাতটা নিজের নাকের সামনে তুলল রাফেলা।

অবাক হয়ে বললাম, মজার বিষয়ের সাথে ঘুসোঘুসির কি সম্পর্ক?

সম্ভবত আমার বিস্ময় লক্ষ্য করেই হাসি চেপে রাখতে পারল না রাফেলা। তারপর বলল, আচ্ছা, তুমি জানো, রঙিন স্বপ্ন দেখলে ঠকতে হয় মানুষকে?

দৃঢ় ভঙ্গিতে জানালাম ওকে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো কথা বলে। আমার অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে, বাকিগুলোও হবে।

স্নান হেসে চুপ করে থাকল রাফেলা। কেন যেন হাসি-ঠাট্টা এরপর আর জমল না, তারপর বহু দূরে কালো একটা বিন্দুর মং সাগরে দেখতে পেলাম হোয়েল-বোটটাকে। পানি আর পেট্রল নিয়ে ফিরে আসছে রডরিক।

চূড়া থেকে দ্রুত নামতে শুরু করলাম আমরা। নারকেলগাছের ভেতর দিয়ে ছুটলাম ওর সাথে দেখা করার জন্যে। প্রান্তর ঘুরে ছোট্ট বে-তে চুকছে ও, এই সময় সৈকতে পৌঁছুলাম আমরা। প্লাস্টিকের ক্যান ভর্তি পেট্রল আর পানির ওজনে পানিতে নিচু হয়ে আছে হোয়েলবোট। স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছে

অনন্তকালের এক গোমড়ামুখো পাহাড়, রডরিক। চিৎকার করে আমাদেরকে হাত নাড়তে দেখে স্বভাবসিদ্ধ গান্ধীর্যের সাথে একবার মাত্র ওপর-নিচে মাথা নাড়ল সে।

বেগম রডরিক আমার জন্যে ব্যানানা কেক আর রাফেলার জন্যে একটা পাম পাতার তৈরি প্রকাণ্ড সান-হ্যাট পাঠিয়েছে। সন্দেহ নেই, রাফেলার আচরণ নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামিয়েছে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে। কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে লক্ষ করে মুখটা গ্রেনেডের মত বিস্ফোরোন্মুখ হয়ে উঠল রডরিকের। ইতিমধ্যেই নিজের চামড়া রোদে ঝলসে নিয়েছে রাফেলা।

.

পঞ্চাশটা ক্যান গুহায় বয়ে নিয়ে আসতে সন্ধ্যা উতরে গেল। আগুন জ্বলে খাড়ি থেকে বিকেলে সংগ্রহ করা চিংড়ি রান্না করছে ল্যাম্পনি। আগুনের ধারে গোল হয়ে বসেছি আমরা সবাই। অভিযানের উদ্দেশ্য এবং বিবরণ আমার ক্রুদেরকে জানাবার এটাই উপযুক্ত সময়। রডরিককে আমি বিশ্বাস করতে পারি, শারীরিক অত্যাচারের মুখেও কোন কথা বের করা যাবে না ওর পেট থেকে। কিন্তু অতটা ল্যাম্পনির কাছে আশা করি না আমি। সেজন্যেই এই নির্জন, লোকবসতিহীন দ্বীপে আসার আগে মুখ খুলিনি আমি। বিশেষ করে মেয়ে পটাবার জন্যে দরকার হলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্য আর গোপন কথা ফাঁস করে দিতেও দ্বিধা করে না ল্যাম্পনি। যাই হোক, এখন ওদেরকে সবকথা বলা যেতে পারে।

আমি কথা বলছি, নিঃশব্দে শুনছে ওরা। আমার সব কথা বলা শেষ হয়ে যেতেও চুপ করে থাকল। ল্যাম্পনি উৎসাহের সাথে অপেক্ষা করছে রডরিক কিছু বলবে এই আশায়। কিন্তু সে ভদ্রলোক প্রকাণ্ড একটা পাথরের মূর্তির মত একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন তো আছেনই, নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই।

প্রায় পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হবার পর, রডরিকের যখন মনে হল পরিবেশটা রোমাঞ্চকর নাটকীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে, ধীরস্থির ভঙ্গিতে নড়ে উঠল সে। কিছু বলবে এবার, এই আশায় আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমাদেরকে সে নিরাশ করল। কথা না বলে প্যান্টের পেছনের পকেটে একটা হাত ভরল সে, সেখান থেকে বের করে আনল একটা মানিব্যাগ। অনেক দিনের পুরানো, একসময় ওটার রঙ ছিল লাল, এখন সেটা কালো হয়ে গেছে, এখানে সেখানে ছিঁড়ে গেছে চামড়া।

ছোকরা বয়সে আমি যখন গানফায়ার রীফে মাছ ধরতাম, আগুনের দিকে এখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রডরিক, তখনকার একটা ঘটনা। সে-সময় একবার আমি প্রকাণ্ড একটা ড্যাডি গ্রুপার ফিশ ধরি। মাছটার পেট কাটার পর সেখান থেকে এই জিনিসটা পেয়েছিলাম। মানিব্যাগ থেকে একটা গোল

চাকতি বের করল সে। সেই থেকে এটা নিজের কাছে রেখেছি, শুভ লক্ষণ হিসেবে। এক জাহাজের অফিসার এটার বিনিময়ে আমাকে দশটা পাউণ্ড দিতে চেয়েছিল, তাকে আমি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলাম।

চাকতিটা নিয়ে আগুনের আলায় পরীক্ষা করলাম আমি। এটা একটা স্বর্ণ মুদ্রা, আকারে একটা শিলিংয়ের চেয়ে বড় নয়। মুদ্রার এক পিঠে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা সিংহ, এক হাতে একটা ঢাল অপর হাতে একটা শিরস্রাণ। ভোরের আলোর ঘন্টার গায়েও এই প্রতীক চিহ্ন দেখেছি আমি। মুদ্রার উল্টো পিঠে ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখা রয়েছে-F~HxAIJ FBIK A~EAB D,y+B~P.

সেই থেকে নিজেকে কথা দিয়ে আসছি, একদিন আমি আবার ফিরে যাব গানফায়ার রীফে, বলে চলেছে রডরিক।

মুদ্রার কোথাও সন তারিখ উল্লেখ নেই। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কোম্পানির একটা মোহর এটা। একটা মাছের পেট থেকে পেয়েছ?

চকচক করছে দেখে গপ করে খেয়ে ফেলেছিল, বলল রডরিক। তারপর পেট থেকে আবার বেরিয়ে যাবার আগেই আমার হাতে ধরা পড়ে যায়।

মোহরটা ফিরিয়ে দিলাম ওকে। তাহলে বুঝতেই পারছ আমার গল্পটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

না, তা নয়, স্বীকার করল রডরিক। গুহা থেকে ভোরের আলোর ভ্রুয়িংগুলো, আর একটা গ্যাস লন্ঠন নিয়ে এলাম আমি। রডরিকের পিতামহ একটা ঈষ্ট ইণ্ডিয়াম্যানের উপমাস্তম্যান হিসেবে সাগরে ছিলেন, তার কাছ থেকে শিখেপড়ে রীতিমত একজন বিশেষজ্ঞ বনে গেছে রডরিক, সুতরাং আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যবহুল অবদান রাখতে পারল সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ভোরের আলোর সব প্যাসেঞ্জারের লাগেজ এবং অন্যান্য ছোটখাট জিনিস ফোকাসলের পাশে ফোর-হোল্ডে ছিল। এ ব্যাপারে তার সাথে তর্ক করতে গেলাম না আমি। যে বিষয়ে কিছুই জানি না সে বিষয়ে তর্ক করতে অনেকবার নিষেধ করে দিয়েছে ও আমাকে।

জোয়ার-ভাটার সময়সূচীটা বের করলাম আমি। হিসেব কষে বের করার চেষ্টা করছি কোন দিন কখন অনুকূল সুযোগ পাব পূলে গিয়ে কাজ করার-এই সময় হঠাৎ রডরিকের চেহারা বিকট বিকৃতি লাভ করল, আর কেউ না বুঝলেও ব্যাপারটা ধরতে পারলাম আমি-রডরিক হাসছে।

ছাপার অক্ষরের ওপর এক বিন্দু আস্থা নেই রডরিকের। এসব জিনিস দেখলেই হাসি পায় ওর। ওর নিজের মাথার ভেতরে একটা সী-ক্লক আছে, সেটার সাহায্যে জোয়ার-ভাটার সময় নির্ধারণ করে ও। অন্য কোন রকম সাহায্য না নিয়ে জোয়ার কখন আসবে তা এক হপ্তা আগে নির্ভুল ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখেছি ওকে আমি।

ভয়ে ভয়ে বললাম, কাল একটা চল্লিশে ভরা জোয়ার আসবে।

ম্যান, বলল রডরিক, জীবনে এই প্রথম হিসেবে কোন ভুল করনি তুমি।

.

ভার মুক্তো হোয়েলবোটটা রীফের ভেতর দিয়ে চ্যানেলের দিকে দ্রুত হুঁদুরের মত ছুটে চলেছে। বো-তে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাম্পনি, পানিতে ডোবা প্রবাল প্রাচীরের বিপদ সম্পর্কে হাত নেড়ে সতর্ক করে দিচ্ছে স্টার্নে বসা রডরিককে। শান্ত পানি পেরিয়ে এসেছি। আমরা। আত্মবিশ্বাসের সাথে ডেউয়ের ভগ্ন-চূড়ার ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বোটটাকে রডরিক। ছোট বোটটা ডেউয়ের গায়ে গুতো মারছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, পাছা দুলিয়ে তাল সামলাচ্ছে-কখনও শূন্যে উঠে আবার নেমে আসছে ঝপাৎ করে। পানির গায়ে, দুপাশ থেকে ছলকে ওঠা পানিতে ভিজে গোসল হয়ে যাচ্ছি আমরা।

প্যাসেজটা যতটা না বিপজ্জনক, তারচেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর। ভয় এবং শিহরণে, আনন্দ এবং বিস্ময়ে কত রকম শব্দ বেরিয়ে আসছে রাফেলার গলা থেকে তার হিসেব রাখা দায়। কণ্ঠ থেকে। বেরিয়ে আসছে তীক্ষ্ণ চিৎকার, কিন্তু এতক্ষণে জানা হয়ে গেছে। সবার, ওটা হাসির আওয়াজ।

প্রবাল প্রাচীরের মাঝখানে সরু গলায় ঢুকল হোয়েলবোট, দুদিকে এক ফিট করে ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। জলকুমারীর তুলনায় হোয়েলবোটের বীম ছোট, গলার ভেতর দিয়ে অনায়াসে আমাদেরকে বের করে নিয়ে এল রডরিক। এরপর চ্যানেলের পেছন দিকের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে ঐক্যবাক্যে বেরিয়ে এলাম আমরা পূলে।

নোঙর ফেলার চেষ্টা করে লাভ নেই, ভারী গলায় বলল রডরিক। পানি এখানে গভীর, রীফ খাড়া নেমে গেছে নিচে। বিশ ফাদম পানির নিচে গজিয়ে আছে হাজার রকম ফ্যাকড়া।

বোট তাহলে স্থির থাকবে কিভাবে? জানতে চাইলাম।

মোটর চালু রেখে পাওয়ারের সাহায্যে।

প্রচুর ফুয়েল খরচ হবে তাতে, রডরিক।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছাড়ল রডরিক। বলল, তা যেন আমার জানা নেই!

জোয়ারের পানি এখনও পুরোপুরি ফুলে উঠতে দেরি আছে, কিন্তু এরই মধ্যে রীফ টপকে এপারে চলে আসছে বড় ঢেউগুলো। তেমন জোর নেই সেগুলোর, পুলের পানির ওপর ধাবমান একটা স্তর তৈরি করছে মাত্র, পানির পাতলা ছাল তুলে নিয়ে সেটাকে লক্ষ-কোটি বুদ্ধবুদ্ধে রূপান্তরিত করছে। সময়ের সাথে সাথে ফুলে-ফেঁপে উঠবে জোয়ারের পানি, রীফ পেরিয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী স্রোত ভয়াল গতিতে ছুটে আসতে শুরু করবে। জোয়ারের স্ফীতি কখনও খুব কম হয়, আবার কখনও খুব বেশি। স্ফীতি কম হলে চ্যানেলে ঢোকার জন্যে প্রয়োজনীয় পানির গভীরতা পাওয়া যায় না, আবার উল্টোটা ঘটলে প্রচণ্ড শক্তিশালী স্রোতে হোয়েলবোট উল্টে যাবার ভয় রয়েছে। আজকের লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব উঁচু হয়েই আসছে জোয়ার। তার মানে আরও ঘন্টা দুয়েক পুলে থাকার সময় পাব আমরা।

প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। রাফেলা এবং আমি এরই মধ্যে ওয়েট সুইচ পরে নিয়েছি। ফেস-প্লেটের স্ট্রাপ বাঁধাও শেষ। ল্যাম্পনি এখন আমাদের পিঠে স্কুবা সেট আটকে দিচ্ছে।

রেডি, রাফেলা?

রেডি।

বোটের কিনারা থেকে পানিতে নামলাম আমরা। দুজন একসাথে চুরুট আকৃতির খালের নিচে চলে এলাম। ওপরে তাকিয়ে দেখি এক ঝলক রূপালী আলোর মত দেখাচ্ছে পানির মোটা স্তরটাকে, একটু লম্বাটে আকৃতির বুদ্ধবুদ্ধগুলো ঠেলাঠেলি করে দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছে ওপর দিকে, ঝলমলে পারদের মত রঙ সেগুলোর।

রাফেলার দিকে মনোযোগ দিলাম আমি। অভিজ্ঞ একজন ডাইভারের মত ধীর স্থিরভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে ও, কোন তাড়াহুড়া বা ব্যস্ততা নেই। ফেস-প্লেটের ভেতর প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে ওর মুখটা। হাসছে।

সোজা নিচের দিকে তাক করলাম আমি মাথাটা, তারপর সুইমিং ফিন-এর সাহায্যে পেডাল মারতে শুরু করলাম। দ্রুত নেমে যাচ্ছি নিচের দিকে, গতি মন্থর করে অক্সিজেন অপব্যয় করতে রাজি নই।

আমাদের নিচে পুলটা গভীর একটা অন্ধকার খাঁদ। চারদিক। ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রবাল প্রাচীর আলোকে ঠেকিয়ে রেখেছে, ফলে ক্রমশ নিচের দিকে গাঢ় হয়ে আসছে অন্ধকার। এদিকের পানি ভীষণ

ঠাণ্ডা, ঘন আর কালো-পরিবেশটা ভৌতিক, গা হুমহুম করে। কি যেন একটা অশুভ শক্তি এর গভীর তলদেশে ওত পেতে রয়েছে।

খাড়া প্রবাল প্রাচীর অনুসরণ করে নামছি আমরা। প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য ঝুল-বারান্দা, কার্নিস আর গুহা দেখতে পাচ্ছি। কোথাও প্রাচীরের গা বেচপ ভাবে ফুলে আছে, কোথাও অনেকটা জায়গা সমতল, মসৃণ প্রাচীরের প্রবাল সব জায়গায় এক জাতের। নয়, কয়েকশো ধরনের প্রবাল দেখতে পাচ্ছি প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ-বিচিত্র তাদের রঙ, গঠন, আকৃতি। সাপের মত কিলবিল করছে সামুদ্রিক লতা, হাজার হাজার কাঙাল যেন দুহাত পেতে ভিক্ষা চাইছে।

রাফেলার দিকে তাকালাম। ঠিক আমার পেছনেই রয়েছে ও। আবার সে হাসল। আমার মত অহেতুক ভয় পায়নি।

আরও নিচে নামছি আমরা। পানিতে তোলপাড় লক্ষ করে অদৃশ্য ঝুল-বারান্দা থেকে ঝুপ করে নামছে হলুদ জায়েন্ট ক্রেফিশ, ধীর ভঙ্গিতে জায়গা বদল করছে ওরা, গুহার ভেতর। ঢুকে বাক নিচ্ছে। অস্পষ্টভাবে টের পাচ্ছি ওদের উপস্থিতি। একটা বিশাল চোখ বা ছড়ানো লেজের অংশ হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি, কখনও পানির একটা মাঝারি তোড় এসে বুক ধাক্কা খাচ্ছে। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু পরিষ্কার আঁচ করতে পারছি। আমাদের উপস্থিতিতে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেছে পানির নিচের এই বৈরী জগতে।

প্রাচীরের গা ঘেঁষে বহু-রঙা মেঘের মত ভেসে যাচ্ছে প্রবাল। মাছের ঝাঁক, স্নান নীলচে আলোয় মণি-মুক্তোর মত রঙ বেরঙের দ্যুতি ছড়াচ্ছে তারা। কাঁধে স্পর্শ অনুভব করে পেছন ফিরলাম আমি। রাফেলার দিকে তাকিয়ে ছাঁৎ করে উঠল বুকটা। মুখে হাসিটা নেই এখন। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্তারিত। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে গভীর এবং অন্ধকার একটা গুহার দিকে তাকালাম আমি।

দুই বিশাল চোখ, তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। অন্ধকার সয়ে আসতে দৈত্যাকৃতি একটা ফ্রপারের প্রকাণ্ড মাথা দেখতে পেলাম। রঙ-বেরঙের চওড়া একটা ঢাল-এর মত মুখটাকে দুভাগে ভাগ করে রেখেছে মোটা ঠোঁট। ঢাল-এর গায়ে সোনালি, সবুজ, হলুদ আর কালো রঙের ছোপ। আমাদেরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সতর্ক হয়ে উঠেছে দৈত্যটা। ক্রমশ ফুলে উঠছে তার পেট, পিঠ আর বুক-দ্রুত ছোট হয়ে আসছে গুহার দুপাশের ফাঁকা জায়গা। নাক ঢেকে রাখা মাংসের পর্দাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে, বিস্ময়কর ভাবে ফুলে আরও বড় হয়ে যাচ্ছে মাথাটা। সবশেষে মুখ খুলল সে, ছুঁচাল দাঁতের সারির ভেতর গভীর একটা গর্ত দেখতে পাচ্ছি-ওখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারবে রডরিক।

আমার হাত চেপে ধরেছে রাফেলা। ধীরে ধীরে ওকে নিয়ে সরে আসছি আমি গুহার কাছ থেকে। তাই দেখে মুখ বন্ধ করল মাছটা, ধীরে ধীরে আগের আকারে ফিরে এল। গ্রুপার মেরে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে চাইলে কোথায় আসতে হবে জানা হয়ে গেল আমার। পানিতে সব জিনিস বড় দেখায়, তা মনে রেখেও বাজি ধরে বলতে পারি কম করেও এক হাজার পাউণ্ড ওজন হবে এই গ্রুপার মহাশয়ের।

প্রবাল প্রাচীর ঘেঁষে আবার আমরা শুরু করেছি নিচে নামতে। অতলতলের অপরিচিত, অজানা, বিচিত্র জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জীবন এবং সৌন্দর্য, মৃত্যু এবং বিপদ। জলজ পাতাবাহারের বিষাক্ত বাহুতে কি সুন্দর ছোট ছোট পরীর মত মাছেরা আস্তানা গেড়েছে, ডগায় বিষ মাখানো খুদে বর্শা ওদের গায়ে বেঁধে না। প্রবাল প্রাচীর ঘেঁষে লম্বা কালো যুদ্ধ-জাহাজের মত পিছলে বেরিয়ে গেল একটা গেল, নিজের গুহার কাছে পৌঁছে গোটা শরীরে সাবলীল ঢেউ খেলিয়ে পাক খেল একটা, ভয় দেখাবার জন্যে ফিরল আমাদের দিকে। কর্কশ, ভোতা এবং উঁচুনিচু দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার, চোখ দুটো সাপের মত জ্বলজ্বল। করছে।

নিচে নেমে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে কয়েকবার তাকালাম ওটার দিকে। অন্ধকারে ঝাপসা হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল।

ফিন দিয়ে প্যাডেল করে আরও নিচে নেমে এলাম আমরা। অবশেষে এতক্ষণে তলাটা দেখতে পাচ্ছি। জলজ উদ্ভিদ, গাছগাছড়া আর ঘন বাঁশঝাড়ে ঢাকা অন্ধকার একটা জগৎ। ফাঁক। ফোকর দিয়ে আরও নিচে খসে পড়া পাতা দিয়ে মোড়া উঁচু-নিচু ঢিবি দেখা যাচ্ছে।

দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ওপর ঝুলে রয়েছে আমরা। টাইম-এলাপস্ রিস্টওয়াচ আর ডেপথ গজটা চেক করে নিলাম আমি। একশো বিশ গজ নেমেছি আমরা, সময় বয়ে গেছে পাঁচ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড।

হাত নেড়ে নিজের জায়গা ছেড়ে নড়তে নিষেধ করলাম রাফেলাকে। একা ডুবে যাচ্ছি জলজ বনভূমির মাথার দিকে। বৃক্ষরাজির পিচ্ছিল পাতা দুহাত দিয়ে সরিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিলাম ফাঁকের ভেতর। জঙ্গল ছুঁড়ে ভেতরে ঢুকে এসেছি কিন্তু তবু এখনও গাছের পাতা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে। বেশ খানিক দূরে আরও নামার পর অপেক্ষাকৃত খোলা একটা। জায়গায় পৌঁছুলাম। বাঁশঝাড়ের পাতা দিয়ে ছাওয়া জায়গাটা, এখানে বাস করে নতুন জাতের মাছ আর জলজ প্রাণী।

এখানে পৌঁছেই বুঝতে পারলাম, পুলের মেঝে সার্চ করা সহজ কাজ হবে না। আবছা অন্ধকারে দশ ফিট দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। অথচ সর্বমোট দুই কি তিন একর এলাকায় খোঁজাখুঁজির কাজ সারতে হবে আমাদেরকে।

ঠিক করলাম রাফেলাকে নিচে আনতে হবে। দুজন মিলে প্রাচীরের ভিতরেখা ধরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত হেঁটে যাব আমরা, পরস্পরের কাছ থেকে দশ ফিট দূরে, দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকব।

ঘন পাতার রাজ্য ছুঁড়ে জঙ্গলের ওপর খোলামেলা পানিতে উঠে এলাম আমি। রাফেলাকে দেখতে না পেয়ে কেঁপে উঠল বুক, পরমুহূর্তে প্রবালের কালো প্রাচীরের গায়ের কাছ থেকে রূপালী বুদ্ধবুদ্ধের মিছিল ওপরে উঠে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগোলাম সেদিকে। আমার কথা না শুনে সরে গেছে ও। ঠিক বিরক্ত নয়, অস্বস্তি বোধ করছি। ওর কাছ থেকে বিশ ফিট দূরে থাকতে দেখতে পেলাম কি করেছে ও। সেই মুহূর্তে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম আমি।

গানফায়ার রীফ-এ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, সর্বনাশ আর নিষ্ঠুর শাস্তি-রাফেলাকে দিয়েই শুরু হল তার সূচনা।

প্রবাল প্রাচীরের গায়ে হরিণের শিং-এর মত গজিয়েছে রঙিন প্ল্যান্ট, শাখা-প্রশাখা ছড়ানো অদ্ভুত সুন্দর এক-একটা কার্টামো সেগুলোর, ম্লান পিঙ্ক ক্রমশ ক্রিমসন রঙে পরিণত হয়েছে গায়ে। এরই একটা ডাল ভেঙেছে রাফেলা। খালি হাতে ধরেছে সেটা। যত দ্রুত সম্ভব ওর দিকে ছুটে যাবার সময় দেখলাম ওর পায়ে হালকাভাবে ঘষা খেল ওই ফায়ার কোরালের লাল একটা প্রশাখা।

কজ্জি চেপে ধরে নিষ্ঠুর এবং সুন্দর প্ল্যান্টের কাছ থেকে সরিয়ে আনলাম ওকে। ওর হাতের মাংসে চেপে বসে গেছে আমার বুড়ো আঙুল, প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকাতে শুরু করেছি ডাল ধরা হাতটা। অভিজ্ঞতা থেকে জানি এই প্রবাল শাখার গায়ে লেপ্টে থাকা লক্ষ লক্ষ খুদে পলিপ তাদের সেল থেকে বিষাক্ত বর্ষা ছুঁড়ে রাফেলার চামড়ায়।

ডালটা ফেলে দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আমাকে দেখছে রাফেলা। ঠিক কি ঘটেছে বুঝতে না পারলেও, খারাপ কিছু যে ঘটেছে সেব্যাপারে সচেতন। সাথে সাথে ওকে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছি আমি। দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠলেও সতর্কতার সাথে পালন করে যাচ্ছি পানির নিচ থেকে ওপরে ওঠার প্রাথমিক নিয়ম, আমার নিজের বুদ্ধবুদ্ধগুলোকে ওভারটেক করছি না, ওগুলোর সাথে সাথে উঠে যাচ্ছি।

রিস্টওয়াচ চেক করলাম-আট মিনিট ক্রিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেছে। ডিকমপ্রেসন-এর জন্যে কতক্ষণ পর পর বিরতি নিতে হবে দ্রুত তার একটা হিসেব কষে নিলাম। অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই আক্রান্ত হল রাফেলা, বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল ওর মুখ। দ্রুত এবং ঘন ঘন ছোট

নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে ও। ডিমাণ্ড ভালবের যান্ত্রিক সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়ে যাবে কিনা ভয় হল আমার। ওটা বিকল হয়ে গেলে বাতাস পাবে না ও।

আমার মুঠোর ভেতর মোচড় খেতে শুরু করেছে ওর হাত। এলোপাথাড়ি পা ছুঁড়ছে পানিতে। উরুর ওপর চাবুক পড়ার দাগের মত লাল হয়ে ফুলে উঠেছে মাংস। ক্রমশ আকারে আরও বড় হচ্ছে সেটা। আঁটো সুইম সুট থাকায় উরু ছাড়িয়ে ওপর দিকে আক্রান্ত হবে না ও, এই ভেবে একটু স্বস্তি বোধ করলাম আমি।

পানির ওপর থেকে পনেরো ফিট নিচে ডিকমপ্রেসন-এর জন্যে থেমেছি, বন্য ঘোড়ার মত হাত-পা খিচাচ্ছে এখন রাফেলা, মোচড় খাচ্ছে শরীরটা। ওকে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আমার পক্ষে।

পানির ওপর মাথা তুলেই মাউথপীস সরিয়ে চঁচিয়ে উঠলাম আমি, রডরিক, কুইক!

পঞ্চাশ গজ দূরে হোয়েলবোট, কিন্তু মোটরটা চালু রয়েছে, কিছু জানতে বা বুঝতে না চেয়ে সেটাকে লেজের ওপর রেখে বিন্ করে আধপাক ঘুরিয়ে নিল রডরিক। হোয়েলবোটের নাক আমাদের দিকে তাক হতেই ল্যাম্পনিকে কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে চলে এল বো-তে।

ফায়ার কোরাল, রডরিক, চঁচিয়ে বললাম ওকে। খুব খারাপভাবে লেগেছে ওকে। তোলো!

হোয়েলবোট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রাফেলার ঘাড়ের কাছে বেল্টটা ধরল রডরিক, পানি থেকে শূন্যে তুলে নিল শরীরটা। ভিজে একটা ঘুড়ির মত রডরিকের কালো মুঠোয় ঝুলছে রাফেলা।

স্কুবা সেট পানিতে খুলে রেখে হোয়েলবোটের কিনারা ধরে উঠে পড়লাম আমি। বোট ঘুরিয়ে নিয়ে পানি থেকে ওটা তুলে নেবে ল্যাম্পনি। রাফেলাকে পাটাতনের ওপর শুইয়ে দিয়েছে। রডরিক, ভাঁজ করা দুই হাতের মাঝখানে আগলে রেখে শান্ত করার চেষ্টা করছে ওকে। অসহ্য ব্যথায় ফঁপাচ্ছে রাফেলা, অবোধ শিশুর মত হাত-পা ছুঁড়ছে। বো-এর কাছে ইকুইপমেন্টের একটা স্তুপের ভেতর মেডিক্যাল কিটটা পেলাম আমি। পেছনে রাফেলার কাতরানি শুনছি, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরও দেরি করে ফেলছে আমার হাতগুলো। মরফিন ভর্তি একটা অ্যামপুলের মাথা ভেঙে সিরিঞ্জের সূচটা চুকিয়ে দিলাম তার ভেতর। শুধু দুশ্চিন্তা নয়, এখন আমার প্রচণ্ড রাগও হচ্ছে।

অন্ধ নাকি তুমি! বকা দিচ্ছি রাফেলাকে। কচি খুকী? কোন সাহসে ছুঁতে গেলে ও-জিনিস!

উত্তর দেবে কি, ঠোঁট দুটো অদম্যভাবে কাঁপছে ওর। উরুর একটু চামড়া দুই আঙুল দিয়ে ধরে তার ভেতর সূচটা ঢুকিয়ে দিলাম। স্বচ্ছ তরল পদার্থ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ওর মাংসের ভেতর।

ফায়ার কোরাল, মাই গড-একজন কংকোলজিস্টের বুড়ো আঙুল হবার যোগ্যতাও তোমার নেই! দ্বীপের একটা বাচ্চা ছেলেও এ-ভুল করবে না!

আমার মনে ছিল না, রানা, অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রাফেলা।

মনে ছিল না! রাফেলার চেহায়ায় ব্যথার ছাপ দেখে আরও রেগে উঠেছি আমি, প্রায় ভেঙে দিলাম ওকে। কেন মনে ছিল না? বোকামির একটা সীমা থাকা দরকার...

সূচটা টেনে বের করে নিলাম ওর উরু থেকে। মেডিক্যাল কিটটা তছনছ করে খুঁজছি অ্যান্টি হিসটাসিন স্প্রে। কচি খুকী, কোলে পড়ে দুধ খাচ্ছে...

ঝট করে প্রকাণ্ড মুখটা তুলে তাকাল আমার দিকে রডরিক। মাসুদ, মিস রাফেলাকে আর একটা কটু কথা বলে দেখা-স্নেহ দুভাগ করে দেব তোমার মাথা। বোঝা গেছে?

ক্ষীণ একটু বিস্ময়ের সাথে বুঝলাম, ঠিক তাই করবে ও, ঠাট্টা করছে না। মাথা দুভাগ করে দিতে এর আগে দেখেছি ওকে আমি, তাই জানি, সেটা এমন একটা ব্যাপার যা এড়িয়ে যাওয়াই উচিত।

বললাম, ভাষণ না দিয়ে দ্বীপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার না আমাদেরকে?

নরম ব্যবহার করো ওর সাথে, ম্যান, তা নাহলে তোমার পেছনের মাংস আগুনে ঝলসাব-যাতে মনে হবে মিস রাফেলার নয়, ফায়ার কোরালে বসার দুর্মাতি হয়েছিল তোমারই।

বিদ্রোহটা অগ্রাহ্য করে রাফেলার ফুলে ওঠা লালচে ঘায়ে অ্যান্টি-হিসটাসিন স্প্রে করছি। তারপর ওকে দুহাত দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। দ্বীপে না ফেরা পর্যন্ত ওকে এভাবে নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা ধীরে ধীরে কমে এল মরফিনের প্রভাবে।

ওকে নিয়ে ঢাল-এর গুহায় ঢুকলাম। ইতিমধ্যে নেতিয়ে পড়েছে ও। সারাটা রাত জেগে বসে থাকলাম ওর পাশে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল ওর, দরদর করে ঘামছে। জ্বরের মধ্যে প্রলাপ বকছে, কিন্তু তা এতই অস্পষ্ট যে কি বলছে বুঝতে পারা গেল না। একবার শুধু ওর ঠোঁটের কাছে কান নামিয়ে শুনতে পেলাম বলছে, দুঃখিত, রানা। জানতাম না আমি। প্রবাল পানিতে এই প্রথম ডাইভ দিয়েছি কিনা। চিনতে পারিনি।

সারারাত জেগে বসে আছে রডরিক আর ল্যাম্পনিও। আগুনের কাছ থেকে ওদের চাপা ফিসফিস আওয়াজ পাচ্ছি। এক আধঘন্টা পর পরই গলা খাকারী দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকছে ওদের একজন, উদ্বেগের সাথে খোঁজ-খবর নিচ্ছে।

এখন কেমন আছে, মাসুদ?

সকালের মধ্যে বিষের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা কাটিয়ে উঠল রাফেলা। ঘা-টা আরও ছড়িয়েছে, এবং আরও পিচ্ছিল লাল আর দগদগে হয়ে উঠেছে, কিন্তু জ্বালা-পোড়া ভাব কমে গেছে অনেকটা।

কিন্তু আরও ছত্রিশ ঘন্টার আগে পূলে যাবার কথাটা তুলতে উৎসাহ পেলাম না আমরা কেউ। প্রসঙ্গটা যখন উঠল তখন উল্টোদিকে বইছে স্রোত। আরেকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে।

প্রতিটি ঘন্টা এখন মহামূল্যবান, কিন্তু নিরুপায় হয়ে লক্ষ করছি সেই মহামূল্যবান সময় আমাকে বিদ্রূপ করে বয়ে যাচ্ছে নিজের পথে, কোন ফায়দা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারছি না আমি। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, পানি কেটে দ্রুত বেগে ছুটে আসছে বুমেরাং। আমার আর সিডনি শেরিডানের মাঝখানে সময়ের প্রচুর ব্যবধান ছিল, এই ব্যবধানের ওপরই ভরসা করেছিলাম আমি-কিন্তু ফাঁকটা দ্রুত ছোট হয়ে আসছে। ভয় হচ্ছে, আমি প্রস্তুত হবার আগেই ছুটে এসে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেবে বুমেরাং।- অথবা হুমায়ুন দাদার জিনবালা ক্রাশবোট।

এগারো

তিন দিনের দিন আবার পূলে এলাম আমরা। রওনা হলাম বিকেলে, তখনও ফুলে ওঠেনি জোয়ারের পানি, ঝুঁকি নিয়ে পানির নিচের প্রবাল কণাগুলোকে কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম।

এখনও স্নান আর নিস্তেজ হয়ে আছে রাফেলা। ব্যাগেজ বাঁধা হাতটার দিকে শোকার্ত নয়নে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর যেন কোন কাজ নেই ওর। ল্যাম্পনিকে সঙ্গ দেবার জন্যে ওকে রেখে আমি আর রডরিক নামলাম পানিতে।

বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর পৌঁছে প্রথম একটা মার্কার বয়া ফেললাম আমি। সুশৃঙ্খল নিয়ম ধরে পূলের তলাটা সার্চ করতে চাই। গোটা এলাকাটা কয়েকটা চৌকো অংশে ভাগ করে নিচ্ছি মোটা নাইলনের রশিতে বাঁধা মার্কার বয়ার সাহায্যে।

এক ঘন্টা পানির নিচে কাজ করলাম। এর মধ্যে জাহাজের বিধ্বস্ত কোন অংশই চোখে পড়ল না আমাদের। উঁচু হয়ে ফুলে থাকা বেটপ ছোট ছোট প্রবাল চিবির গায়ে শ্যাওলা আর লতানো চারা গজিয়েছে, সেগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা না করে কিছু বলার সময় এখনও অবশ্য আসেনি। আমার উরুতে আটকানো আগুরওয়াটার স্লেটে বিষয়টা টুকে রাখলাম।

এক ঘন্টার শেষের দিকে আমাদের জোড়া নাইনটি কিউবিকফিট বটলের এয়ার রিজার্ভ কমে যাওয়ায় কষ্ট পাচ্ছি আমরা। আমার চেয়ে বেশি বাতাস ব্যবহার করেছে রডরিক, আমার চেয়ে আকারে বড় ও, তাছাড়া কম খরচের কৌশল জানা নেই ওর-তাই। নিয়মিত পরীক্ষা করছি ওর প্রেশার গজ। অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে চেষ্টা করলে রক্তে বুদবুদ সৃষ্টি হবে, আর একটা খুদে বুদবুদ যদি বেনে পৌঁছায়, স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে-রডরিককে এ কথা বোঝানো কঠিন। তাই বারবার নানা ছুঁতোয় বাধা দিয়ে দেরি করিয়ে দিতে হচ্ছে।

পেলে কিছু? পানির ওপর আমরা মাথা তুলতেই জানতে চাইল রাফেলা। মাথা নাড়লাম, সাঁতার কেটে চলে এলাম হোয়েলবোটের কাছে।

বিশ্রামের সময় থার্মোস থেকে এক কাপ করে কফি খেলাম আমরা। একটা চুরুট ধরলাম আমি। এক ডুব দিয়েই সাত রাজার ধন তুলে আনতে পারিনি বলে আমরা সবাই একটু নিরাশ হয়ে পড়েছি।

সদ্য চার্জ করা বটলে ডিমাণ্ড ভালব বদলে নিয়ে আবার আমরা নামলাম পানিতে। এবার আমি একশো ত্রিশ ফুট নিচে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি থাকব না। কারণ প্রতি ডাইভে গ্যাস জমছে রক্তে, বারবার গভীর পানিতে ডাইভ দেয়া বিপজ্জনক।

বাঁশ ঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়েছি আমরা। প্রবালের অলিগলির ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছি, ফাটল আর বেচপ স্ফীতি পরীক্ষা করার জন্যে এখানে সেখানে থামছি। কৌতূহল জাগাচ্ছে এমন প্রতিটি জিনিস চিহ্ন দিয়ে রাখছি স্লেটে আঁকা ম্যাপে। মার্কার বয়ার মাঝখানে জায়গাটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বারবার যাওয়া-আসা করছি। তেতাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে যাবার পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকলাম আমি রডরিকের দিকে। আমাদের কারও সুইমসুট ফিট করে না ওকে, তাই মাস্কাতা আমলের কালো উলেনের একটা বেদিং কস্টিউম ছাড়া উলঙ্গ হয়ে নেমেছে ও। আমার একটা বন্ধু-ডলফিনের মত দেখাচ্ছে ওকে। বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটা দৈত্য যেন ছুটোছুটি করে খুঁজছে কাকে। মাথা ঘুরিয়ে নেব, এই সময় বাঁশঝাড়ের ঘন পাতার মাঝখানে কোথাও একটু ফাঁক পেয়ে এক চিলতে ল্লান আলো ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঠিক রডরিকের নিচেই কি যেন চিক চিক করে উঠল সেই আলোয়। দ্রুত ঢুকে পড়লাম ঝাড়ের ভেতর। সাদা একটা বস্তু, প্রথমে মনে হল এটা একটা ক্ল্যাম শেলের টুকরো। কিন্তু তারপর লক্ষ্য করলাম জিনিসটা ক্ল্যাম শেলের তুলনায় অনেক। বেশি মোটা, এবং আকৃতির মধ্যে একটা সৌষ্ঠব রয়েছে। ওটার আরও কাছে চলে এলাম আমি, দেখলাম কঠিন প্রবালের গায়ে আটকে আছে জিনিসটা। বেল্ট থেকে হাতুড়িটা বের করে কিছুক্ষণ প্রবালের গায়ে ঠোকাঠুকি করতেই আলগা হয়ে বেরিয়ে এল একটা খণ্ড। পাঁচ পাউন্ডের বেশি ওজন হবে বলে মনে হল, নেটের ব্যাগে ভরে নিলাম ওটা। তাকিয়ে দেখি আমাকে লক্ষ্য করছে রডরিক। ওপরে ওঠার সিগন্যাল দিলাম ওকে।

পেলে কিছু? পানির ওপর আমরা মাথা তুলতেই ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল রাফেলা।

সাঁতার কেটে বোটের কাছে এলাম আমরা। নেট ব্যাগটা দিলাম রাফেলাকে। জানি না, বললাম ওকে। কিন্তু আমার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। নেটের ভেতর থেকে সাদা জিনিসটা বের করতে ব্যস্ত সে।

এরই মধ্যে রীফ টপকে তেড়ে আসতে শুরু করেছে চেউয়ের মিছিল, টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে পুলের পানি। বিরামহীন। আন্দোলনে টলমল করছে হোয়েলবোট, তাকে এক জায়গায় ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ল্যাম্পনি। একদিনের পক্ষে যথেষ্ট সময় পানির নিচে কাটিয়েছি আমরা, তাছাড়া, পুলে থাকার নিরাপদ সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে-কিছুক্ষণ পরই ভারত মহাসাগরের প্রচণ্ড স্রোত আর বিশাল চেউ প্রবাল প্রাচীরকে ডুবিয়ে দিয়ে আছড়ে পড়বে পুলের ওপর।

ফিরিয়ে নিয়ে চল, রডরিক, বললাম ওকে। দ্রুত মোটরের কাছে চলে গেল ও।

অসংখ্য বুনো ষাঁড়ের মত ঢেউয়ের মিছিল, সেগুলোর পিঠে চড়ে ফেরার সময় অন্য কোনদিকে খেয়াল দেবার অবকাশ পেলাম না আমরা। উগ্র মেজাজী স্রোতের ধাক্কায় সারাক্ষণ কাত হয়ে আছে হোয়েলবোট, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে গিয়ে আছাড় খেতে পারে চ্যানেলের পাঁচিলে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ-সাথে রডরিক রয়েছে। চুলচেরা হিসেবে কোথাও একটু ভুল করল না সে। ইঞ্জির ব্যবধানে সমস্ত বিপদকে ফাঁকি দিয়ে রীফের পেছন দিকের সুরক্ষিত পানিতে আমাদেরকে বের করে নিয়ে এল। তারপর বাক নিয়ে দ্বীপের দিকে তাক করল হোয়েলবোট।

পুল থেকে তুলে নিয়ে আসা প্রবাল খণ্ডটা এবার মনোযোগ দাবি করল। কিভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে ওটাকে সে বিষয়ে অহেতুক উপদেশ খয়রাত করছে রাফেলা। পাটাতনে রেখে হাতুড়ির বাড়ি মেরে তিন টুকরো করে ফেললাম ওটাকে। প্রবালের ভেতর সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল কয়েকটা জিনিস, বেরিয়ে পড়ল সেগুলো।

মার্বেল আকারের তিনটে গোল জিনিস রয়েছে। প্রবালের বিছানা থেকে সেগুলোর একটা তুলে নিয়ে ওজন অনুভব করলাম। বেশ ভারী। রাফেলার বাড়ানো হাতে তুলে দিলাম ওটা।

বল দেখি, কি ওটা?

মাস্কেট বল, নির্দিষ্টায় বলল রাফেলা।

আরে, তাই তো! জিজ্ঞেস করার আগেই জিনিসটা চিনতে পারা উচিত ছিল আমার। যাই হোক, পরের জিনিসটা ওর আগে চিনতে পারার কৃতিত্ব আদায় করার জন্যে তাড়াতাড়ি বললাম, এটা? এটা একটা ছোট পিতলের চাবি।

তুমি একটা প্রতিভা! বিদ্রূপের সুরে বলল রাফেলা। যে জিনিস দেখা মাত্র চেনা যায় সেটাকে চিনতে পারার মধ্যে কৃতিত্ব কতটুকু জানি না।

ওর কথায় কান না দিয়ে যে সাদা জিনিসটা দেখে প্রবাল খণ্ডটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবার সেটা খুব সাবধানে প্রবালের গা থেকে মুক্ত করে নিলাম আমি। একটা চীনামাটির টুকরো, উল্টোদিকে নীল নকশা আঁকা রয়েছে। নেড়েচেড়ে দেখার সময় বুঝতে পারছি একটা চীনামাটির প্লেটের ভাঙা কিনারা এটা, সাদা, চকচক করছে। উল্টোদিকের নকশাটা মাত্র অর্ধেক রয়েছে টুকরোটায়, কিন্তু পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সিংহটাকে। প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা। তারমানে এটাও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটা জিনিস, ভোরের আলোর এক সেট প্লেটের ক্ষুদ্র একটা অংশ।

রাফেলার হাতে প্লেটের ভাঙা কিনারাটা দেবার সময় আমি হঠাৎ কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম ভোরের আলো কিভাবে ভেঙে যাচ্ছে। উত্তেজিত ভাবে ব্যাপারটা বলতে শুরু করলাম ওকে। চীনা মাটির টুকরোয় আঙুল বুলিয়ে আদর করছে ও, মনোযোগ দিয়ে শুনছে আমার কথা।

স্রোত আর রীফের চাপে মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়েছিল ভোরের আলো, ফলে তার সব ভারী কার্গো জায়গা বদল করে, ইনার বাল্কহেড ভেঙে বেরিয়ে আসে। খোল থেকে কামান, গোলা, প্লেট আর সিলভার, ফ্লাস্ক আর কাপ, মুদ্রা আর পিস্তল-সব সে ঢেলে দেয় পুলের দিকে এবং এতদিনে প্রবাল সব হজম করে ফেলেছে।

কর্নেলের কেসগুলো? জানতে চাইল রাফেলা। সেগুলো কি পড়ে গেছে খোল থেকে?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে আমাদের কথা রডরিক, হঠাৎ সে কথা বলতে শুরু করল, ফোরহোল্ড সবসময় ডবল ছালের হয়, তিন ইঞ্চি মোটা ওক কার্ঠের প্ল্যাঙ্ক-যাতে ঝড়-ঝাপটার সময় কার্গো জায়গা বদল করতে না পারে। ওখানে সেদিন যা ছিল, আজ এখনও তাই আছে।

তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, হাততালি দিয়ে বলল বলল রাফেলা। তুমি না থাকলে কি দশা যে হত আমাদের, ভাবতে ভয় করে, রডরিক।

প্রশংসা পেয়েই অভ্যস্ত রডরিক, কিন্তু রাফেলার কাছ থেকে হঠাৎ জিনিসটা পেয়ে লজ্জায় একেবারে মাটির সাথে মিশে গেল সে। ভদ্রতা দেখিয়ে একটু হাসল সে, মনে হল প্রচণ্ড আক্রোশে ঘোঁত ঘোঁত করছে। তবে এতদিনে রাফেলা চিনতে পারে ওটা হাসি, আক্রমণের পূর্ব লক্ষণ নয়। তারপর দূর দিগন্তরেখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, যেন দুনিয়ার কোন বিষয়ে ওর কোন আগ্রহ নেই।

দ্বীপে ফিরে ভোজন এবং বিশ্রামের সময় দীর্ঘ আলোচনা হল বিষয়টা নিয়ে। একটা ব্যাপারে একমত হলাম আমরা পুলের তলায় ভোরের আলোর সম্পূর্ণ সামনের অংশটা পড়ে আছে, এবং তার ওপর কয়েক স্তর প্রবাল জমে পাথর হয়ে গেছে, সেই শক্ত পাথরে গজিয়েছে শ্যাওলা এবং জলজ চারা।

ঠিক হল আমাদের কাজটা দুই ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। প্রথম কাজ কেসগুলো কোথায় আছে তা অনুমান করা, তারপর সেগুলোকে প্রবালের দৃঢ় আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করা।

এর জন্যে কি জিনিসের দরকার হবে আমাদের তুমি জানো, রডরিক, বললাম আমি। সাই দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও।

সেই কেস দুটো আছে তো? রাফেলার সামনে জেলিগনাইটের নাম উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ করলাম আমি।

এদিক-ওদিক মাথা দোলাল রডরিক। নেই, মাসুদ। ওগুলো সাংঘাতিক ঘামছিল। কেউ যদি পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে হাঁচি দিত, নির্ঘাৎ দ্বীপের মাথাটা উড়িয়ে নিয়ে যেত বিস্ফোরণের সাথে। তাই আমি আর ল্যাম্পনি মোজাম্বিক চ্যানেলের কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছি ওগুলো।

তাহলে উপায়?

মিস্টার গোথলে রামাদীনের সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে, জানাল রডরিক। সে জোগাড় করে দিতে পারবে।

তাই কর, বুঝলে। এরপর যখন সেন্ট মেরীতে যাবে। তিন বাক্স, কেমন?

জলকুমারী থেকে যে আনারসগুলো উদ্ধার করেছি সেগুলো। দিয়ে কাজ চালানো যায় না? জানতে চাইল ল্যাম্পনি।

আনারস মানে এম-কে সেভেন হ্যাণ্ড গ্রেনেড। না, বললাম। ওকে। একশো ত্রিশ ফুট পানির নিচে ও জিনিস নিয়ে নামছি না আমি।

.

ভোরে ঘুম ভাঙতেই চারদিকে নিস্তব্ধ অস্বাভাবিকতা লক্ষ করে বিস্মিত হলাম আমি। একই সাথে বাতাসে একটা উত্তাপ অনুভব করছি। জেগে শুয়ে আছি, গভীর মনোযোগের সাথে চেষ্টা করছি শুনতে, কিন্তু একটা শব্দ নেই কোথাও। সারাক্ষণ চরে বেড়ায় যে কাঁকড়াগুলো, তাদেরও কোন সাড়া নেই। নারকেলগাছের পাতাগুলো এমন কোন সময় নেই যখন খস খস করে না, অথচ তারাও একেবারে স্থির হয়ে গেছে। একমাত্র শব্দ পাচ্ছি আমার পাশে শুয়ে থাকা মেয়েটার নিঃশ্বাস পতনের। আলতোভাবে ওর কপালে চুমু খেললাম আমি, তারপর বহুকষ্টে ঘুম না ভাঙিয়ে ওর মাথার নিচ থেকে আমার হাতটা সরিয়ে নিলাম। রাফেলার দাবি, বুদ্ধি হবার পর থেকে সে নাকি কখনও বালিশ ব্যবহার

করেনি, ওতে নাকি মেরুদণ্ডের ক্ষতি হয়। কিন্তু তাই বলে আমার শরীরের কোন অংশকে বলিশ হিসেবে ব্যবহার করতে উৎসাহের কোন অভাব দেখিনি ওর মধ্যে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দুর্বল হাতটা ম্যাসেজ করছি। তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, স্নান, রুগ্ন লাগছে ভোরটাকে। একটু বাতাস নেই।

আগুনে ডালপালা যোগাচ্ছে রডরিক, ফুঁ দিয়ে জ্যান্ত করে তুলতে চাইছে। আমাকে দেখে মুখ তুলল। ঘামে ভিজ়ে গেছে প্রকাণ্ড মুখটা।

কিছু বুঝতে পারছ, রডরিক? জানতে চাইলাম আমি।

আবহাওয়া একটু তামাশা করবে।

ঠিক কি আসছে, রডরিক?

কাঁধ ঝাঁকাল ও। আটাশ পয়েন্ট দুই-এ নেমে গেছে গ্লাসতবে এখনই কিছু বলার সময় আসেনি-দুপুরের মধ্যে জানা যাবে। আগুনে আবার ফুঁ দিতে শুরু করল ও।

সকাল এগারোটায় পুলে নামলাম আমি আর রডরিক। পঁয়ত্রিশ মিনিট হল নেমেছি, এখনও উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার করিনি, এই সময় ক্লিঙ্ক, ক্লিঙ্ক-ক্লিঙ্ক! ক্লিঙ্ক, ক্লিঙ্ক-ক্লিঙ্ক!-পানির ভেতর দিয়ে আসছে আওয়াজটা। থেমে গেছি আমি, শুনছি। লক্ষ করছি স্থির হয়ে গেছে রডরিকও। আবার এল শব্দটা, একই ছন্দে দুবার।

পানির ওপর থেকে তিন ফুট লম্বা লোহার রেইলের অর্ধেকটা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে ওপরের অংশে হাতুড়ির ঘা মারছে ল্যাম্পনি।

রডরিককে ইশারা করে ওপরে উঠতে শুরু করলাম আমি।

বোটে ওঠার সময় রাগের সাথে জানতে চাইলাম, ব্যাপারটা কি, ল্যাম্পনি?

উত্তরে নিঃশব্দে একটা হাত তুলল ল্যাম্পনি। রীফের পেছন দিকের উঁচু নিচু মাথার ওপর দিয়ে সাগরের দিকে তাকালাম আমি।

কিছুই দেখতে পেলাম না। মাস্ক খুলে চোখ পিট পিট করে তাকালাম আবার। এবার দেখতে পেলাম। অমনি ছাঁৎ করে উঠল বুক। দূর সাগরের গায়ের কাছে কালো দেখাচ্ছে ওটাকে। চিকন একটা ফিতের মত। কাঠ-কয়লা দিয়ে থেয়ালী সৃষ্টিকর্তা যেন দিগন্তরেখা বরাবর একটা সরল রেখা ঝাঁকছে। কিন্তু আমাদের তাকিয়ে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে রেখাটা মোটা হচ্ছে, সেই সাথে ছড়িয়ে গিয়ে বড় হচ্ছে আরও লম্বায়। সাগরের নিচে যেন আগুন ধরে গেছে, তা থেকে ধোঁয়া উঠে এসে ঢেকে দিচ্ছে ল্লান নীল আকাশের বিশাল গম্বুজের নিচের দিকটা।

চাপাস্বরে গর্জে উঠল রডরিক, আঁতকে উঠে ঝাঁকি খেলাম আমি। গস্তীরভাবে হাসছে ও।

ভদ্রমহিলা আসছেন, ম্যান! পাগলি ভদ্রমহিলা-চিনতে পারছ, মাসুদ?

নিঃশব্দে অনেকটা সম্মোহিতের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে জানালাম, পারছি চিনতে।

লেডি সি, বলল রডরিক। খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলাকে।

নিচু, গাঢ় সম্মুখ অংশটার তীব্রগতি অপার্থিব লাগছে আমার চোখে। পলক পড়ার আগে গোত্রাসে গিলে নিচ্ছে নীলচে আকাশের বিশাল এলাকা, তুমুল গতিতে টেনে নিয়ে আসছে কালো একটা পর্দা।

উঠে এসে গলুইয়ে আমার পাশে বসল রাফেলা, রাবারের ওয়েট স্যুট খুলতে সাহায্য করছে আমাকে।

কি, রানা?

লেডি সি, বলে দ্বীপের লোকেরা, জানালাম ওকে। সাইক্লোন। কয়েক বছর পর-পরই যখন মর্জি হয় আসে। ভোরের আলোকে ডুবিয়েছিল এই লেডি সি। আবার শিকার খুঁজতে বেরিয়েছে।

ফোরপীক থেকে লাইফবেল্ট বের করে প্রত্যেককে একটা করে দিল ল্যাম্পনি। যে যারটা বেঁধে নিয়ে একসাথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম আমরা সবাই। বিস্ফারিত চোখে দেখছি প্রকৃতির প্রলয় আয়োজন। অশুভদর্শন কালিমায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দ্রুত এই-বড় প্রকাণ্ড আকাশ।

ভীত-সম্ভ্রান্ত হুঁদুরের মত ছুটছি আমরা হোয়েলবোট নিয়ে, মুখ ব্যাদান করে পিছু ধাওয়া করছে আমাদেরকে সাইক্লোনটা। চ্যানেল পেরিয়ে এসে ভেতরের পানির ওপর দিয়ে হোয়েলবোটকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রডরিক। আমরা সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছি পেছনের দিকে। সবার অস্তিত্ব জুড়ে একটা অসহায় বোধ চেপে বসেছে। কত ক্ষুদ্র আর নগণ্য আমরা, অথচ আমাদেরকে বিনাশ করতে প্রকৃতির কি ভয়াবহ আয়োজন-সুস্ফীত বিস্ময়ে এর বেশি কিছু ভাবতে পারছি না।

বে-তে যখন ঢুকছি, মেঘের সামনের ভাগটা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে পর্দা টেনে সামনে চলে এল। দপ করে নিভে গেল দিনের প্রায় সবটুকু আলো, অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে গেল চারদিক। প্রথম ঝাপটাটা হিম শীতল চাবুকের মত বাড়ি মারল পিঠে, সবাই একসাথে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম আমরা বোটের ওপর। বিচ্ছিন্ন একটা তোড়ের মত চলে গেল সেটা আমাদের ওপর দিয়ে। তারপর বালি আর পানির ফণা নিয়ে এল পরবর্তী ঝাপটা। কিন্তু সাগর আর দ্বীপমালা ছুঁয়ে এসেছে বলে এটা প্রথম ঝাপটার মত শক্তিশালী নয়।

মোটর! আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল রডরিক, সেই মুহূর্তে তীর স্পর্শ করল হোয়েলবোট। একজন পরিশ্রমী লোকের অর্ধেক জীবনের সঞ্চয় এই নতুন মোটর দুটো, ওর উদ্ব্বেগ যথার্থ বলে মনে নিলাম আমি।

সাথে করে তুলে নিয়ে যাব আমরা, আশ্বাস দিয়ে বললাম ওকে।

বোটটা?

ডুবিয়ে দেব। তলায় এদিকে শক্ত বালি, শুয়ে থাকতে পারবে।

মোটর দুটো খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি আর রডরিক। আমাদের সমস্ত ইকুইপমেন্ট এক জায়গায় জড়ো করে ক্যানভাস দিয়ে মুড়ে ফেলছে ল্যাম্পনি আর রাফেলা। নাইলনের রশি দিয়ে ক্যানভাসের চার প্রান্ত এক করে বাঁধল ওরা, তারপর আরও মোটা একটা রশি দিয়ে পেট মোটা পোঁটলাটাকে বোটের সাথে বেঁধে রাখল

রডরিক আর ল্যাম্পনি ভারী মোটর দুটো নামাল তীরে। ওদেরকে এগোতে বলে বাতাসের সাহায্যে বে-তে নিয়ে এলাম। বোটকে, তারপর ড্রেইন প্লাগগুলো খুলে দিলাম। ফুটোগুলো দিয়ে পানি ঢুকে দ্রুত ভরিয়ে দিচ্ছে বোটটাকে। বিশ ফুট পানির নিচে ডুবে গেল সে।

প্রতিটি ঢেউ মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, শরীর কাত করে সাঁতার কেটে তীরে ফিরে এলাম। রাফেলাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে ল্যাম্পনি, কিন্তু আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রডরিক। দুজনে মোটর দুটো তুলে নিলাম যার যার কাঁধে। শিরদাঁড়া খাড়া করেই হাঁটছে রডরিক, কিন্তু মোটরের ওজনে বেঁকে গেছে আমারটা, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাঁটছি।

পেছন দিকে তাকালাম আমি। প্রহরীর ভূমিকা নিয়েছে রডরিক, সবার পেছনে রয়েছে ও। সাদা বালি উড়ছে, সম্পূর্ণ। ঢাকা পড়ে গেছে ওর কোমর পর্যন্ত।

নারকেল গাছ এলাকায় ঢুকেছি, এই সময় দ্বীপে আঘাত করল সাইক্লোনের অপেক্ষাকৃত বড় ধাক্কাটা। ত্রিশ সেকেন্ডের মত স্থায়ী হল সেটা, আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, যেন একসাথে কুর্গিশ করছে কাউকে।

ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ল্যাম্পনি। রাফেলা একা এগিয়ে যাচ্ছে, সবার সামনে রয়েছে ও, দুহাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মাথাটাকে। ল্যাম্পনিকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় চিৎকার করে বললাম, মাথা নিচু কর! কিন্তু চিৎকারটা আমার মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তীব্র বাতাস, ল্যাম্পনি পর্যন্ত তো দূরের কথা, চার ইঞ্চি দূরে আমার কান পর্যন্তও সেটা পৌঁছল না। গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল আমার।

নারকেল গাছগুলোর এই আতঁনাদ চিরকাল মনে থাকবে আমার। নুয়ে পড়ছে ওরা, আতঙ্কে আর তীব্র যন্ত্রণায় একটানা কাতরাচ্ছে। ঝড়ের তীব্রতায় পলকের জন্যে একটু ঢিল পড়লেই ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের মত বিদ্যুৎবেগে আবার খাড়া হয়ে যাচ্ছে ওরা, তীব্র ঝাঁকি খেয়ে পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে কামানের ভয়ঙ্কর গোলার মত শক্ত নারকেল ছুটে আসছে আমাদের দিকে। এগুলোর একটা আমার কাঁধের ওপর ভারী মোটরে ড্রপ খেল, হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে গিয়ে কোন রকমে সামলে নিলাম। আরেকটা আমাদের পায়ে চলা পথের পাশে পড়ল, ড্রপ খেয়ে লাগল গিয়ে রাফেলার হাঁটুর নিচে। নারকেলের এই আঘাতে তেমন জোর ছিল না, তবু দড়াম করে পড়ে গেল রাফেলা, বাতাস ওকে গড়িয়ে নিয়ে গেল খানিকদূর। আমি ওর কাছে পৌঁছবার আগেই উঠে দাঁড়াতে পারল ও। কিন্তু পেছন থেকে লক্ষ করছি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

ঢাল বেয়ে উঠছি আমরা, আমাদেরকে ঘিরে উন্মত্ত গর্জন করছে নারকেল গাছগুলো। ঢালের মাথায় প্রায় পৌঁছে গেছি, এই সময় সাইক্লোনের বিস্ময়কর একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। নারকেল গাছের সর্গর্জন তাগুব, ঝড়ের একটানা বিকট হুঙ্কার ছাপিয়ে উঠল নতুন একটা আওয়াজ। তীক্ষ্ণ নয়, ভরাট এবং গম্ভীর শব্দটা দূর কোথাও থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে, মাথার অনেক ওপর দিয়ে।

মাটিতে একটা কম্পন অনুভব করছি। নারকেল গাছের শিকড় এবং জড় ধরে টান দিয়েছে এবার সাইক্লোন, এবং সামনে তাকাতেই দেখি প্রথম গাছটা ভেঙে পড়তে যাচ্ছে।

পঞ্চাশ ফুট উঁচু গাছটা নুয়ে পড়তে পড়তে কাঁপছে থরথর করে, বাতাসকে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্যাভীত চেষ্টা করছে সে, ফলে ক্রমশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে, আরও নুয়ে পড়ছে মাটির দিকে। গাছটার ভিতের চারপাশের মাটি ফুলে উঠছে একটু একটু করে, বেলে মাটির নিচে ছড়ানো শিকড়গুলো ছিড়তে শুরু করেছে প্রচণ্ড টানে। ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে গাছটা, কাঠুরের কুঠারের মত মাথার ওপর থেকে নেমে আসছে সেটা আমাদের সামনে। আমার পনেরো ফুট সামনে রয়েছে রাফেলা, নিচের দিকে তাকিয়ে ঢালের। মাথা থেকে মাত্র নামতে শুরু করেছে। হাত দুটো দিয়ে এখনও চেপে ধরে রেখেছে ও মাথাটাকে।

গাছটা যেখানে পড়ছে ঠিক সেই জায়গার দিকে ছুট য়াচ্ছে রাফেলা। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড। ওই জায়গায় রাফেলাও পৌঁছুবে, ঠিক তখন গাছটাও পড়বে। আঘাতটা টেরও পাবে না ও, তার আগেই মারা যাবে। এত কাছে রয়েছে ও, অথচ আমার বজ্রকণ্ঠের চিৎকার মোটেও শুনতে পাচ্ছে না। ঝড়ের গর্জন আমাদের সমস্ত বোধ আর অনুভূতি উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মোটরটা ফেলে দিলাম আমি। ছুটছি। কিন্তু জানি, দেরি। করে ফেলেছি অনেক। সময় মত পৌঁছুতে পারব না ওর কাছে। অনুভব করছি হতাশায় দুর্বল হয়ে আসছে আমার শরীর। তারপর, মরিয়া হয়ে উঠে, যতটা না রাফেলাকে বাঁচাবার জন্যে, তারচেয়ে ওর সাথে একত্রে মরার অদ্ভুত এক জেদের বশে ডাইভ দিলাম আমি। সামনে সবটুকু বাড়িয়ে দিয়েছি দুই হাত। রাফেলার পেছনের পায়ে বাড়ি মারলাম, পা-টা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে ও, ঠিক সেই মুহূর্তে, ধাক্কা খেয়ে দুই পা ঠুকে গেল রাফেলার, হাঁটু ভেঙে ওখানেই পড়ে গেল ও। দুজন হাত-পা। ছড়িয়ে পড়ে আছি, এই সময় ধরাশায়ী হল গাছটা। বজ্রপাতের মত কড়াক করে ভাঙল কাণ্ডটা। পতনের ধাক্কায় কেঁপে উঠল মাটি, দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল আমার।

স্প্রিংয়ের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, টেনে তুললাম রাফেলাকে। গাছটা আঠারো ইঞ্চির জন্যে ছুঁতে পারিনি ওকে। আতঙ্কে স্থবির হয়ে গেছে ও। দুহাত দিয়ে ধরে কয়েক সেকেন্ড ঝাঁকালাম ওকে। এতক্ষণে তাকাল আমার দিকে ও। দুহাত দিয়ে শূন্যে তুলে নিলাম ওকে, ধরাশায়ী গাছটাকে উপকে এপারে এসে নামিয়ে দিলাম আবার মাটিতে। দৌড়াও। চেষ্টা করে উঠলাম ওর কানে।

কথা শুনল রাফেলা। টলতে টলতে এগোল ও। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে ওর গতি। মোটরটা আবার কাঁধে তুলতে আমাকে সাহায্য করল ল্যাম্পনি। তারপর আবার একবার গাছটা উপকে ছুটন্ত রাফেলাকে অনুসরণ করলাম আমি।

চারদিকে কড়াক কড়াক শব্দে গাছ ভাঙছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি সম্ভাব্য বিপদ আগেভাগে টের পাবার জন্যে। ঢালের মাথায় উঠে পড়েছি নিজের অজান্তে, ফলে বাতাসের অবিচ্ছিন্ন ধাক্কাটার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না, প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লাম সামনের দিকে, ঢালের মাথা থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়লাম পাঁচ হাত নিচে, মোটরটা কাঁধ থেকে ছোঁট একটা লাফ দিয়ে একপাশে পড়ে গড়াতে শুরু করেছে।

গড়িয়ে নেমে যাচ্ছি আমরা। সামনে পড়ল রাফেলা। ওর পায়ের সাথে ধাক্কা খেল আমার বুক, ফলে হাঁটু ভেঙে আমার গায়ের ওপরেই পড়ে গেল ও। মোটর, আমি, রাফেলা-পাল্লা দিয়ে গড়িয়ে নামছি এখন।

এই আমি রয়েছি ওপরে, পরমুহূর্তে আমার দুই শোল্ডার বেডের মাঝখানে বসে রয়েছে রাফেলা বার্ড, তারপর দেখা যাচ্ছে আমাদের দুজনের ওপর চড়ে বসে আছে মোটরটা।

ঢালের নিচে পৌঁছে থামলাম আমরা। বাতাসের ছোবল বাধা পাচ্ছে ঢালের মাথায়, জায়গাটা প্রায় নিরাপদ। আহত পশুর মত হাঁপাচ্ছি আমরা। ল্যাম্পনি নেমে এসে পরীক্ষা করল রাফেলাকে। হাড়গোড় ভাঙেনি ওর। রডরিককে নামতে দেখে আবার আমরা রওনা হলাম।

মোটরটা ওদের গুহায় রেখে রাফেলাকে সাথে নিয়ে ফিরে এলাম নিজেদের গুহায়। ঢাল ভেঙে সাইক্লোনের চোদ্দ গোষ্ঠীর সাধ্য নেই এই গুহায় ঢোকে, সুতরাং খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিজেদেরকে পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমরা। তারপর ক্যানভাস দিয়ে গুহার মুখটা ঢেকে দিল রাফেলা। আমি গ্যাস স্টোভটা জ্বলে কফির জন্যে পানি চড়ালাম।

কি সাংঘাতিক, তাই না? বলল রাফেলা। থামবে কখন?

পাঁচ দিন পর, মুচকি হেসে বললাম ওকে। কান পেতে শুনছি ঝড়ের অবিচ্ছিন্ন ভৃঙ্কার।

কি! কে বলল তোমাকে?

এই ঝড়ের এ-ই মেয়াদ।

তার মানে...

হ্যাঁ, মুচকি হেসে বললাম। প্রকৃতি আমাদেরকে পাঁচ দিনের জন্যে কয়েদ করেছে। এই সময়টা আমরা পরস্পরকে আরও গভীরভাবে জানার কাজে ব্যয় করতে পারি।

কে চায় তা? ঠোঁট উল্টে তাকিচ্ছিল্য প্রকাশ করল রাফেলা, যা মোটেও ঠাট্টা বা কৃত্রিম বলে মনে হল না আমার।

সেই সন্দেহটা ফিরে এল আমার মনে। রাফেলা কি আমাকে ঘৃণা করে?

অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক ছোটখাট ঘটনা স্মরণ করে সিদ্ধান্ত নিলাম, সম্ভবত তাই, ও বোধহয় আমাকে ঘৃণাই করে। কিন্তু কেন?

এর কোন সম্ভাব্য উত্তর জানা নেই আমার।

মনে মনে আরেকবার স্বীকার করলাম, এখনও আমার কাছে দুর্ভেদ্য একটা রহস্য হয়েই রয়েছে রাফেলা বার্ড।

রসদের অভাবে প্রথম তিন দিন অভুক্ত থাকল রডরিক আর ল্যাম্পনি। ঝড়ের বেগ দুপুরের পর এত বেড়ে গেল যে একশো গজ পেরিয়ে বড় গুহাটার কাছে আসতে সাহস হল না ওদের।

দ্বিতীয় দিন সকালে আমি রওনা হবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, এই সময় রডরিক এসে হাজির। এই একশো গজের মধ্যে ও যা দেখে এসেছে তার যা বর্ণনা ওর কাছ থেকে পেলাম তাতে শিউরে উঠলাম আমরা। অর্ধেকের বেশি নারকেল গাছ শুয়ে পড়েছে মাটিতে, যেগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর মাথা কামিয়ে ন্যাড়া করে দিয়েছে ঝড়।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিলাম রডরিককে। বাইরে নতুন সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে লেডি সি।

ঘরের ভেতর পরিবেশটা স্বাস্থ্যকর না হলেও রাফেলার অদ্ভুত আচরণে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে ও। রাতে পাশাপাশি শুচ্ছি আমরা, কিন্তু কেউ কারও গায়ে হাত না দেবার কঠোর নিয়ম মেনে চলছি। যদিও এ ব্যাপারে দুজনের কারও তরফ থেকেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।

এখন পর্যন্ত আমার সম্পর্কে ওর নিজের অনুভূতি কি তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেনি ও। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়েও কোন উচ্চবাচ্য করিনি আমরা।

আমার কথা বাদ দিলেও, রাফেলা নিজে যে শান্তিতে আছে তাও নয়। খাচ্ছে, হাসছে, ঘুমাচ্ছে, কিন্তু এসবের মধ্যে মাঝে মাঝে চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখেছি ওকে।

চার দিনের দিনও ঝড়ের প্রকোপ এতটুকু কমল না। ইতিমধ্যে রাগ আর বিরক্তির উত্তাপ ঝলসে গেছি আমি। নিষ্ফল আক্রোশে খাঁচায় বন্দী বাঘের মত সারাটা দিন গুহার ভেতর পায়চারি করে কাটালাম।

পঞ্চম দিনে ভোর বেলা জেগে উঠলাম আমি। গোটা দ্বীপের কোথাও কোন শব্দ নেই। ঝড়ের তাগুবের পর এই নিস্তব্ধতা অসহ্য লাগছে, চোখ না খুলে কিছু একটা শুনতে পাবার আশায় কান পেতে আছি। পাশে নড়ে উঠল রাফেলা। চোখ মেলে তাকালাম আমি।

ঝড় থেমে গেছে, মৃদু গলায় বলল ও। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

ভোরের কচি রোদে বেরিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়ালাম। আমরা। ধ্বংসের যে চিহ্ন রেখে গেছে ঝড় তা চোখ পিটপিট করে দেখছি। যুদ্ধবিধ্বস্ত রণক্ষেত্রের ফটোর মত চেহারা হয়েছে দ্বীপটার। নারকেল গাছগুলো আক্ৰহীন, উলঙ্গ-যেন আকাশের দিকে ঠাং তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি চাপা পড়ে গেছে পাতা আর নারকেলে। সব কিছু স্থির হয়ে আছে, বাতাসের একটু নড়াচড়া নেই কোথাও। নীলচে আকাশটাকে ল্লান করে রেখেছে এখনও বালি আর পানির কণা।

যেন শীতকালটা কাটিয়ে নিজেদের গুহা থেকে বড় ভালুক আর ছোট ভালুক বেরিয়ে এল-অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাচ্ছে ওরাও, রডরিক আর ল্যাম্পনি।

অকস্মাৎ ক্যাঙ্গারুর মত একটা লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল ল্যাম্পনি, হুপ করে আওয়াজ ছাড়ল সে। তারপর লেজ তোলা বাছুরের মত নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে ছুটল সে।

সবচেয়ে পরে পানিতে নামবে যে সে একজন ফ্যাসিস্ট, চৈঁচিয়ে ঘোষণা করল ল্যাম্পনি।

চ্যালেঞ্জটা সবার আগে গ্রহণ করল রাফেলা।

রাফেলার চেয়ে দশ ফুট আগে থেকে প্রথম সৈকতে পৌঁছুল ল্যাম্পনি, কিন্তু খাড়িতে ওরা ঝাঁপ দিয়ে নামল একসাথে। তারপরই একজন আরেকজনের দিকে মুঠো ভর্তি বালি ছুঁড়ে মারামারি বাধিয়ে দিল।

উজ্জ্বল রঙের ডোরাকাটা পাজামা পরা রডরিককে নিয়ে পানিতে নামলাম আমি। কয়েক পা এগিয়ে বালির ওপর বসলাম আমরা, আমাদের কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে পানির নিচে। কড়া কয়েকটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লাম আমি, তারপর চুরুটটা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

পাঁচটা দিন হারিয়েছি আমরা, রডরিক, ওকে বললাম।

ঘরঘরে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল রডরিকের গলার ভেতর থেকে। তার মানে দুঃখ প্রকাশ করছে ও। হাড়ভাঙা খেটে পুসিয়ে নেয়া যাবে, মাসুদ, আশ্বাস দিল আমাকে। নাও, ওঠো, এম্ফুনি কাজে লাগতে হবে।

.

এয়ারব্যাগের সাহায্যে পানি থেকে তুলে বৈঠা চালিয়ে তীরে নিয়ে এলাম আমরা হোয়েলবোট। সারাদিন ব্যস্ত থাকার মত যথেষ্ট কাজ রয়েছে হাতে। ক্যানভাসের মোড়ক থেকে ইকুইপমেন্টগুলো বের করে ধুয়ে মুছে রোদে শুকাতে হবে, গুহা থেকে নিয়ে এসে বোটে ফিট করতে হবে মোটর দুটো, বাতাস

ভরতে হবে এয়ার বটলে-তারপর গানফায়ার রীফে যাবার প্রস্তুতি। সন্ধ্যার পর ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে আলোচনার সময় আমরা সবাই স্বীকার করলাম যে ভোরের আলোর কিছুটা অংশ পুলের দিকে পড়েছে, বাস, এর বেশি কিছু এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি আমরা। অথচ এক এক করে দশটা দিন পেরিয়ে গেছে। বিপদ এখন যে-কোন দিক থেকে ঘাড়ে এসে পড়তে পারে।

যাই হোক, পরদিন জোয়ারের চার্ট দেখে খুব ভোরেই রওনা হতে পারলাম আমরা। আবছা অন্ধকারে পানির নিচের ছড়ানো প্রবালকণা দেখা যায় কি যায় না, কিন্তু নির্বিঘ্নে আমাদেরকে রীফএর পেছন দিকে নিয়ে এল রডরিক। হোয়েলবোট যখন থামল পুলে, সূর্যের ওপরের কিনারা সবে মাত্র দিগন্তরেখার কাছে উঁকি দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে হাত এবং উরুর ঘা প্রায় শুকিয়ে গেছে রাফেলার। এবং আজ তার একই জেদ, আমার সাথে পানিতে নামবে ও।

ওকে নিয়ে দ্রুত নেমে এলাম আমি, বাঁশঝাড়ের ভেতর ঢুকে পজিশন নিলাম সেই মার্কারের কাছে, শেষবার ডাইভ দিয়ে আমি আর রডরিক যেখান থেকে উঠে গিয়েছিলাম। চৌকো জায়গাটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে ফিরে আসছি আবার, এরই মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নিজের বলে টোকা মারতে শুরু করল রাফেলা। বাঁশের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোচ্ছি ওর দিকে।

প্রাচীরের কাছে বাদুড়ের মত পা ওপরে মাথা নিচে করে রয়েছে রাফেলা, প্রবালের একটা ধস এবং মেঝেতে জমে থাকা স্তূপ পরীক্ষা করছে ও। ঝুলে থাকা প্রবালের গাঢ় ছায়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ও, ঠিক কি পরীক্ষা করছে তা একেবারে ওর পাশে না পৌঁছানো পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

প্রাচীরের গায়ে একদিকে কাত হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা, গোল আকৃতির জিনিসটা। নিচের প্রান্তটা প্রবাল স্তূপ আর জলজ উদ্ভিদের ভেতর ঢুকে রয়েছে। বাকি অংশে মৃত প্রবাল জমে পাথর হয়ে গেছে, তার ওপর আবার জীবিত প্রবালেরা বসতি স্থাপন শুরু করেছে। তবু আকৃতির সৌষ্ঠব দেখে বোঝা যায় এটা মানুষের হাতে তৈরি জিনিস-নয় ফুট লম্বা, বিশ ইঞ্চি চওড়া, নিখুঁত গোল। দেখেই চিনতে পেরেছি আমি, উত্তেজনায় ঘাড়ের পেছনে খাড়া হয়ে উঠেছে চুলগুলো। দুই হাত এক করে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে পিস্তল তৈরি করে দেখালাম রাফেলাকে, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রয়েছে ও। দ্রুত আমার স্নেটে লিখলাম-কামান।

প্রচণ্ড বেগে মাথা নেড়ে সমর্থন করল এবার রাফেলা, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার, একগাদা বুদ্ধবুদ্ধ ছেড়ে বিজয়ের উল্লাস প্রকাশ করল।

ভোরের আলোর নাইন পাউণ্ডার কামান এটা, কিন্তু এর গায়ের খোদাই করা লেখা বা প্রতীক চিহ্ন পড়ার কোন উপায় নেই, সব হজম করে ফেলেছে প্রবাল। কামানটাকে ঘিরে চারদিকে ঘুরছি, এই সময় প্রাচীরের আরও কাছাকাছি আরেকটা কামান দেখতে পেলাম আমি। প্রথমটার ব্যারেলের নিচে দিয়ে সাঁতার কেটে সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি এটার তিন চতুর্থাংশ প্রাচীরের গায়ে ঠেকে আছে, এবং জীবন্ত প্রবালেরা সেটুকু ঢেকে রেখেছে সম্পূর্ণ। বাকি অংশটা পুলের মেঝেতে পড়ে রয়েছে, কিন্তু বিশাল প্রবালের স্কুপে চাপা পড়ে গেছে সেটুকুও।

আরও কাছে পৌঁছে ছাঁৎ করে উঠল কলজে। অনুভব করছি, হার্টবিট বেড়ে গেছে আমার।

ফুলে উঁচু হয়ে থাকা টুকরো প্রবালের স্তূপের ওপর দিয়ে দ্রুত এগোচ্ছি আমি, খুঁজছি কোথা থেকে আবার শুরু হয়েছে অবিচ্ছিন্ন কঠিন প্রবাল এলাকা। বাঁশঝাড় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, ফাঁক দিয়ে এগোচ্ছি আমি। টুকরো প্রবালের স্তূপটার আকার রেলগাড়ির একটা বগির মত। জলজ উদ্ভিদের বড়সড় একটা চাপড়া সরাবার পর দেখতে পেলাম গানপোর্টের ভোতা মুখটা, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কামানের মাস্তুলটাও চিনতে পারছি, তবে গায়ে শক্ত হয়ে এঁটে বসে থাকা প্রবাল ওটার চেহারা বদলে দিয়েছে। উল্লাসে চৈঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার। ফ্লিগেট ভোরের আলোর সম্পূর্ণ সামনের অংশটা আবিষ্কার করেছি আমরা, মেইন মাস্টের ঠিক পেছন থেকে ভেঙে পুলের এপারে পড়েছে।

এর মধ্যে আমার পাশে চলে এসেছে রাফেলা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় অধীর হয়ে হাত দিয়ে আমার কাঁধ খামচে ধরল ও। ঝট করে মাউথপীস সরিয়ে চুমো খেল আমার গলায়। আবার জায়গা মত মাউথপীসটা বসিয়ে নিল ও। ওপরে উঠে যাবার ইঙ্গিত দিলাম ওকে আমি। কিন্তু প্রচণ্ডভাবে মাথা দোলাচ্ছে ও। হাত ছুঁড়ে সরে গেল আমার নাগালের বাইরে, ধরা দেবে না। অর্থাৎ আবিষ্কারটা ছেড়ে উঠতে চাইছে না ও।

ঝাড়া দশ মিনিট চেষ্টা করার পর রাজি করলাম ওকে। পানির ওপর মাথা তুলে দুজন একসাথে চৈঁচামেচি জুড়ে দিলাম। ওর চেয়ে আমার গলার জোর বেশি, কিন্তু ওরটা আমার চেয়ে তীক্ষ্ণ। অভিযানের নেতা হিসেবে আগে কথা বলার অধিকার আমার, এই বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে আরও কিছু সময় ব্যয় হল। হোয়েলবোটে উঠে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম রডরিকের কাছে।

ওটা ভোরের আলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রীফ পেরিয়ে এপারে আসার পরপরই কার্গো আর আর্মামেন্টের ভারে সোজা ডুবে গেছে, ভারি একটা পাথরের মতো। প্রাচীরের গা ঘেষে পড়ে রয়েছে অংশটা। খোল থেকে খসে পড়েছে একটা কামান। টুকরো প্রবালের নিচে...

আমাকে বাধা দিয়ে আবার শুরু করল রাফেলা, প্রথমে চিনতে পারিনি আমরা। জঞ্জাল, আবর্জনার নিচে রয়েছে কিনা...

কোন্ ভঙ্গিতে শুয়ে আছে ও? প্রথম কথাটাই কাজের কথা রডরিকের।

উল্টে রয়েছে, বর্ণনা করলাম আমি, ডুবে যাবার সময়...

তাহলে তো সমস্যা, বলল রডরিক। গানপোর্ট দিয়ে ভেতরে ঢোকা যাবে?

এদিক ওদিক মাথা দুলিয়ে বললাম, ভাল ভাবে দেখে এসেছি, কিন্তু খোলে ঢোকান কোন রাস্তা পাইনি। গানপোর্টগুলো ঢেকে দিয়েছে প্রবাল।

আরও ভাল করে দেখতে হবে। চল যাই, উৎসাহের সাথে বলে উঠল রাফেলা।

এক ঘন্টা বিশ্রাম, বললাম আমি। গরম কফি আর চুরুট দরকার এখন।

আবার ডাইভ দিয়ে বেশিক্ষণ নিচে থাকতে পারলাম না আমরা। রডরিকের সিগন্যাল পেয়ে পানির ওপর মাথা তুলে দেখি প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে পূলে, রীফ থেকে লাফ দিয়ে নামছে তীব্র গতির স্রোত।

রডরিক আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। খড়ির প্রশান্ত পানিতে পৌঁছে আবার আমরা মুখ খুললাম।

ব্যাঙ্কের ভল্টের মত নিচ্ছিদ্র খোলটা, জানালাম ওদেরকে। একটা গানপোর্ট জুড়ে রয়েছে কামানটা। আরেকটা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলাম, কিন্তু চার ফুটের বেশি এগোতে পারিনি। বাল্কহেডের একটা অংশ ধসে পড়ে বন্ধ করে রেখেছে পথটা। প্রকাণ্ড পাইথানের মত দেখতে একটা স্টিলের আস্তানা এখন ওটা, ওর দাঁতগুলো বুলডগের মত। আমি বেরিয়ে আসছি, এই সময় কোথাও থেকে ফিরছিল ও। ওর সাথে আলোচনা না করেই বুঝে নিয়েছি-আমাদের বন্ধুত্ব হবে না।

কোমরের কাছে কোন ফাঁক দেখতে পাওনি? জানতে চাইল রডরিক।

নেই, বললাম ওকে। হয়ত ছিল এককালে, কিন্তু প্রবাল সমস্ত ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে দিয়েছে। ভোরের আলো, ধরে নাও, এখন একটা পাথরের তৈরি জাহাজ। ভেতরে ঢুকতে হলে গর্ত করে ঢুকতে হবে, আর কোন উপায় নেই।

তাই মনে হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল রাফেলা, কিন্তু এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করলে... বিস্ফোরণে সব কিছু টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না তো?

আমরা তো আর অ্যাটম বোমা ব্যবহার করব না, বলাম ওকে। ফরওয়ার্ড গানপোর্টে আধ টুকরো জেলিগনাইট দিয়ে শুরু করব আমরা, শুধু প্রবালের স্তর সরাবার জন্যে তাই যথেষ্ট। একটু বিরতি নিয়ে রডরিককে জিজ্ঞেস করলাম, আজ রাতে আমাদেরকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেন্ট মেরীতে?

প্রশ্নটা অপমানকর বলে মনে করল রডরিক, তাই উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

মাঝরাতের অনেক পরে সেন্ট মেরীতে পৌঁছলাম আমরা। গ্র্যাণ্ড হারবারে হোয়েলবোট নোঙর করে উঠে এলাম নির্জন, চন্দ্রালোকিত রাস্তায়।

বেগম রডরিক দরজা খুলে দিল আমাদেরকে। এর আগে তাকে হ্যাট ছাড়া খালি মাথায় দেখিনি। রডরিকের মত তার মাথা কামানো নয় দেখে বিস্মিত হলাম আমি। আর সব ব্যাপারে আশ্চর্য মিল রয়েছে দুজনের।

কফি খেয়ে বিদায় নিলাম আমরা। পথে পোস্টাফিসের সামনে পিক-আপ দাঁড় করিয়ে নেমে গেলাম আমি। আমার লেটারবক্সটা অর্ধেক ভরা অবস্থায় পেলাম। কয়েকজন পুরানো চার্টার পার্টি আমার হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে কিনা জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছে, চিঠিগুলোর সাথে একটা টেলিগ্রামও দেখতে পাচ্ছি। খারাপ খবর নিয়ে আসাই স্বভাব এগুলোর, তাই ভয়ে ভয়ে পড়তে শুরু করলাম মেসেজটা।

যা ভেবেছি। কেপ টাউন থেকে আমার বন্ধু জানাচ্ছে, ওখান থেকে ছয়দিন আগে রওনা হয়ে গেছে বুমেরাং।

আসছে সিডনি শেরিডান। যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়ে দ্রুত আসছে সে।

.

ভোর। সূর্য উঠবে এবার।

থামলে কেন? মুখের সামনে হাত রেখে একটা হাই তুলল সোহানা।

বালিশ থেকে মাথা নামিয়ে সোহানার গলায় মুখ ঠেকাল রানা। আর পারছি না, সোহানা। ধরে নাও ঘুমিয়ে গেছি আমি। চোখ বুজল ও।

না! আবদারের সুরে বলল সোহানা। রাফেলা-রাফেলা বার্ডের কথা আরও বল আমাকে-শুনতে চাই।

চুপ করে থাকল রানা। সারারাত জেগে ভীষণ ক্লান্ত ও। আড়মোড়া ভাঙল।

তোমার প্রথম প্রেম? ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা।

হ্যাঁ। তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?

একটু। কিন্তু তুমি তো জান, এতে আমার কিছু এসে যায় না। আমার প্রাপ্য আমি পেয়েছি তোমার কাছে। যতটা যোগ্যতা, তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। তোমার জীবনে কত মেয়ে এসেছে-সব মেনে নিতে পারি আমি। আসলে ঈর্ষা হচ্ছে না, সত্যি। কিন্তু ভাবছি, কি সুন্দর প্রেম...ওই রাফেলা যদি আমি হতাম, তোমার প্রথম প্রেম যদি আমার সাথে হত-বড় ভাল হত। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, এখনও মনে পড়ে ওকে?

পড়ে।

আরও খাদে নেমে গেল সোহানার কণ্ঠস্বর। এখনও ভালবাস?

বাসি। ওকে নয়।

পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর জানা আছে সোহানার, তবু করল প্রশ্নটা। কাকে?

হাসল রানা। পাশ ফিরে চোখ মেলল।

তুমি তা জান। ধীরে ধীরে রানার একটা হাত জড়িয়ে ধরছে সোহানার ক্ষীণ কটি। জানো না?